হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র

বি. এন. রায়

হিন্দু-বিজ্ঞান সূত্র

"মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি ?"

পবিত্র হিন্দুত্ব সাধন

কেন ?

তবে শুনুন

মূল্য কত ?

এখন বিনা মূল্যে

সময়াভাবে ?

পরার্দ্ধ মুদ্রা

মূল্য এবং কেন ?

এতৎ হিন্দু বিজ্ঞানসূত্রং

শ্রী বিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি. এন. রায় প্রণীত

সান্যাল এণ্ড কোং।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগানষ্ট্রীট ভারত মিহির যন্ত্রে,
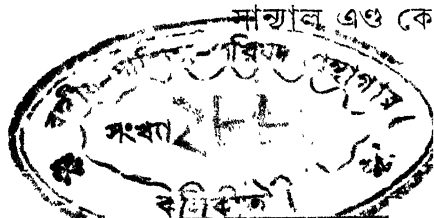
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৩ সন।

হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র

বা

আত্মতত্ত্ব।

ষষ্ঠ সংখ্যা, } অগ্রহায়ণ, { ১২১২ সন।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল ঝাঁপতাল।

"হর শঙ্কর শশিশেখর পিণাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতি-ভূষণ দিক্-বসন জাহ্নবী-জটাভারে॥
অনল ভালে মদন-দমন, তরুণ অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণিহারে।
উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা লক্ষ পিশাচপক্ষ রক্ষক ভব পারে॥"

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীমহাদেব শম্ভো! সর্ব্বপ্রকারের অপরাধ ক্ষমা করিয়া সদয় ও সন্নিকট হও। আশুতোষ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

ভাই পাঠকবৃন্দ! হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রপ্রণেতা বীর বিশ্বনিন্দুক এখনও জীবিত আছে। বয়ঃক্রম চুয়ান্ন বৎসর চলিতেছে। এ বৃদ্ধ বয়সে আবার একটী অভিযানে প্রবৃত্ত হইলাম। বীর বিশ্বনিন্দুক কি এ যাত্রায় অপমানিত হইবে? ব্রহ্মময়ীর কৃপা থাকিলে কখনই অপমানিত হইবে না। আপনারা উপস্থিত ষষ্ঠ অভিযানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া

বাদকগণ ইংরেজী (The neccesity is the mother of invention) অনুবাদ স্থলে (অভাবই সৃষ্টির মূল) এবম্বিধ অনুবাদ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ শব্দ অভাবকে কলুষিত করিয়া প্রকারান্তরে অমূল্য দর্শন-শাস্ত্রকে কলুষিত করিয়াছেন। এই কৌতুকাবহ ভ্রমে নিপতিত বর্ত্তমান বঙ্গীয় লেখক-দলের অনেকে অভাব শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিতেছেন, ইহার সংশোধন নিতান্তই আবশ্যক। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র ২য় সংখ্যায়, ইহার বিস্তারিত আলোচনা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। গতিকেই অত্রস্থলে সংক্ষেপে বলিতে হইল যে, কামই সৃষ্টির মূল। অভাব বা ভাবের ভিন্নতা স্থলবিশেষে সৃষ্টি ব্যতীত উহা কখনই সৃষ্টির মূল নহে। যাঁহারা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কেবল তাঁহার কাম্ বা ইচ্ছা-শক্তি প্রভাবেই জগতের সৃষ্টি হইতেছে। অপিচ জীবকৃত প্রত্যেক সৃষ্টির মূলেই কাম, কামনা বা ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। অতএব কামই সৃষ্টির মূল ব্যতীত অভাব সৃষ্টির মূল নহে।

অত্রস্থলে অপর একটী বিষয় বক্তব্য এই যে, বীরের ভাণ্ড কখনই গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদিরা ছাড়া নহে। চাপা দিতে ইচ্ছা করিলেও ভুর ভুর করিয়া গন্ধ উঠে। বীর-প্রদত্ত সুধা পান করিব। অথচ মাদকের সম্পর্ক দেখিলেই শিহরিয়া উঠিব, এ অতি অন্যায় আবদার। আমি অতঃপর বালক পাঠকবৃন্দের জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিলেও ঘটনার চক্রে যদি কিছু প্রকাশ পায়, বুদ্ধিমান্ পাঠক যেন ক্ষমা করেন।

পিতৃপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিলে শুভাদৃষ্টের সঞ্চার হয়। এই প্রাচীন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া বংশ-বিবরণের অপ্রকাশিত অংশ নিম্নে কীর্ত্তন করিতেছি। বঙ্গে কায়স্থসভা সংস্থাপিত হওয়ার পর চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে। উক্ত মহাসভা, উহার মুখপত্র কায়স্থপত্রিকা বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দের প্যামফ্লেট (pamphlet) প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থের

পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা বা অনুসন্ধান হইয়াছে, উহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহাদের কুটুম্বাদি বা স্বজাতীয় অন্যান্য মহাত্মাদিগের মহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা অনুসন্ধান করিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি-বিবরণ জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থসভার সাহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বারেন্দ্র, বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ী ও উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ মহাত্মাদিগের নিকট সুপরিচিত মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর কায়স্থসভার সভাপতি মুরহর দেবের বংশধর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ" নামক পুস্তক হইতে "হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের সহিত বারেন্দ্র কায়স্থগণের সম্বন্ধ" শিরোনামা বিশিষ্ট ষোড়শ অধ্যায় হইতে ভৃগু নন্দীর বংশ-বিবরণ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ মন্তব্যও প্রকাশ করিলাম।

উক্ত পুস্তকের ১১৩ পৃষ্ঠা "৯৯৪ শকাব্দায় অর্থাৎ ১০৭২ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে বারেন্দ্র কায়স্থ সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থাপয়িতা ভৃগু নন্দী মহাশয় মহারাজ বল্লাল সেনের সভায় আগমন করেন। তৎকালে সেন রাজবংশের প্রতাপ-ভাস্কর মধ্যাহ্ন গগন হইতে অধিক অপসৃত হয় নাই। ১০১০ শকাব্দায় অর্থাৎ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল পঠীবন্ধন ও মর্য্যাদা প্রথার সৃষ্টি করেন। তৎপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভৃগু নন্দী বল্লাল সেনের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।" উপরোক্ত ভৃগুনন্দী মহাশয়ই আমাদের আদিপুরুষ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে বঙ্গে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত হন।

১১৫ পৃষ্ঠা "শিব নন্দীর বংশজাত মনোহর নন্দী মহাশয় দিল্লী সহরে বাদসাহী সেরেস্তায় মুন্সীগিরি কর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করত দেশে প্রত্যাগত হয়েন। দিল্লীর একজন সঙ্গতিপন্ন লালা কায়স্থ তাঁহার গুণপণায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করেন।

এ সম্বন্ধে ঢাকুরে সুস্পষ্ট উক্তি আছে। অতএব দেখিতে পাই এ সময়েও পশ্চিম প্রদেশীয় সদাচারসম্পন্ন লালা কায়স্থগণ বারেন্দ্র কায়স্থগণের সহিত স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতেন। এমন কি তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সসম্মানে পোতাজিয়া গ্রামে বসতি করিতেছেন।" আমি স্বয়ং উপরোক্ত যুগলের বংশধর। শিবনন্দী, ভৃগু নন্দী মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ মনোহর নন্দী মহাশয় দাস সম্রাট্‌দিগের অধিকার কালে দিল্লীতে কার্য্য করিতেন। পারিবারিক জনশ্রুতিতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে ইঁহার সময়ে পিতৃপুরুষেরা আহারের জন্য স্বর্ণথাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন।

১১৬ পৃষ্ঠা "১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করত কাননগু দপ্তরের সৃষ্টি করেন। ভৃগুনন্দীর বংশধর গোপীকান্ত রায় ঐ কাননগু দপ্তরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজা মানসিংহ রায় মহাশয়ের কর্ম্মতৎপরতায় প্রীত হইয়া তাঁহার স্বগ্রাম অষ্টমুনিষা ও আরও কয়েক খানি গ্রাম তাঁহাকে মিলিক লিখিয়া দেন অর্থাৎ নাম মাত্র কর ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে ঐ কয়েক খানি গ্রাম জায়গীর স্বরূপ দান করেন। গোপীকান্তের বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।" গোপীকান্ত রায় মহাশয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ না হইলেও ভৃগু নন্দীর বংশধর বটেন, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন।

১১৬ পৃষ্ঠা "যখন ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন শিবনন্দীর বংশজাত রূপরায় মহাশয় নবাব সায়েস্তা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পূর্ব্বে দেওয়ানী কার্য্যে বাহাল হয়েন।" আমি স্বয়ং ভৃগুপুত্র শিবনন্দীর শাখায় জাত। রূপরায় মহাশয় আমার পূর্ব্বপুরুষ বা তাঁহাদের জ্ঞাতি ছিলেন জানি না।

১১৬ পৃষ্ঠা "ভৃগুনন্দীর পুত্র কানুর বংশধরগণ মধ্যে রাজ্যধর রায়

নামে এক ব্যক্তি এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহ-সরকারে বাঙ্গলার উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আরবি ও পারস্ত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।" রাজ্যধর রায় মহাশয় ভিন্ন শাখা হইলেও আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন।

১১৭ পৃষ্ঠা পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান রূপরায়ের পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে * * * গোবিন্দরাম রায় মহাশয় ঢাকার নবাবের দেওয়ানী করিতেন। তিনি পোতাজিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নবরত্ন মন্দির সংস্থাপন করেন। তদ্বংশীয়গণ নবরত্নপাড়ার রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বংশীয় দেবীদাস রায় মহাশয় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বিভাগের প্রধান সচিব ছিলেন। পরে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করেন। দেবীদাসও নায়েব-দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ মহিমাপুরে আসিয়া বসতি করেন। নবাব-সরকারে দেবীদাসের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে খাঁ-বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।" গ্রাম্য জনশ্রুতিতে আমার যাহা ধারণা আছে, তাহাতে গোবিন্দরাম রায় মহাশয় নবাবের ক্রোড়ী ছিলেন। উপরোক্ত দুই ব্যক্তি মাধবের ধারা অর্থাৎ ভিন্ন শাখা হইলেও আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন। ক্রোড়ী, কাননগু, রায়-রাঁইয়া, নায়েব-দেওয়ান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উচ্চ রাজপদে মাধবের শাখার অনেকে নিযুক্ত ছিলেন এবং উল্লিখিত পদগুলি অপেক্ষা নিম্নতর রাজপদেও বংশের অনেকেই নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান-অধিকার কালে মাধবের শাখা খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে অন্যান্য শাখাকে অতিক্রম করিয়াছিল।

১১৭ পৃষ্ঠা "এই সময়ে পোতাজিয়ার প্রসিদ্ধ রায় বংশের ভবানীশঙ্কর রায় মহাশয়, বাঙ্গলার রায়-রাঁইয়া পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায়-রাঁইয়া পদ আধুনিক সেশনজজের তুল্য পদ ছিল।" আমি উল্লিখিত ভবানী-

শঙ্কর রায়ের বংশধর। ভবানীশঙ্কর রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বংশের ইতিহাস মৎকর্ত্তৃক হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে মসীজীবির কার্য্যে এতদ্দেশে কায়স্থ জাতির বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ভৃগুবংশের অনেকে প্রাদেশিক রাজা ও মহারাজাদিগের প্রধান প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। যতই অনুসন্ধান হইবে ভৃগুবংশের অবস্থা বিস্তারিত রূপে জানা যাইবে। পিতৃপুরুষদিগের কটুম্বগণও রাজসরকারে প্রধান প্রধান রাজপদে কার্য্য করিতেন। আমাদিগের বংশবিবরণে উহা প্রকাশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

আমাদের বংশে ভবানীশঙ্কর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় নবাব-সরকারে কোন বড় চাকুরি করিতেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য অপেক্ষা গুদিবাড়ি ষ্টেটের খরিদা অংশ দখল করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। তাঁহার সময়ে অন্যের জমিদারী দখল করা বিশেষ কঠিন কার্য্য ছিল। জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় গুদিবাড়ি ষ্টেটের খরিদা বহু অংশ দখল করিয়া একজন দুর্দ্ধর্ষ জমিদার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রবণে পরগণার অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমার মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুকালীন শেষ বাক্য এই যে "আমার সোণার ভানু কা'কে দিয়ে গেলাম।" মাতাঠাকুরাণী আমাকে ভানু বলিয়াই ডাকিতেন। অপর আমার প্রতিপালিকা বড় মাতৃস্বসা ঠাকুরাণী আমার সঙ্গে সঙ্গে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া বিগত ১৯এ আশ্বিন রাত্রিতে চিথলিয়ার বাটী হইতে পরলোকগতা হইয়াছেন। তিনি চিরজীবন আমাকে 'শ্যামাচরণ বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র প্রথম পাঁচ সংখ্যা একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর বংশে

জন্ম ও মৃত্যুর বর্ণনা এবারে করিলাম না। এই কাল মধ্যে আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপদ রায়ের শুভ বিবাহ মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ রায় মহাশয়ের পৌত্রী অথবা উক্ত স্থলের জজ-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত তরণীমোহন রায় বি. এল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হৈমবতীর সহিত এবং মেজ দাদা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র রায়ের শুভ বিবাহ জাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বি. এল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নালতার সহিত হইয়াছে।

ভৃগুবংশে মাধবের ধারা মহিমাপুরের শাখায় রণজিৎ রায় মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পৈত্রিক ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য্য হেতু তিনি বিশেষ কোন চাকুরি করেন নাই। উর্দ্দু, পারস্য ও বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত অপিচ পলাশী-যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা, মিরজাফর, লর্ড ক্লাইব, রাজা রাজবল্লভ এবং রাজা রায়চুর্ল্লভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান্ ব্যক্তিবর্গের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। বিশেষ কোন চাকুরি না করিলেও নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক অনেক স্পেশ্যাল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উহা উদ্ধার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। মহিমাপুরে বাস নিবন্ধন নিজ প্রতিভার গুণে জগৎশেঠের পরিবারে একপ্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিতেন। কলিকাতা-পতনের সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণেল ক্লাইব ও এড্মিরাল ওয়াটসন্‌কে পাঠাইয়া রায় মাণিক-চাঁদকে দূরীকরণপূর্ব্বক কলিকাতা পুনরধিকার করিলে পর পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয়, তাহা এই রণজিৎ রায় মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি উর্দ্দু ভাষায় ভৃগুবংশের বিশেষতঃ মাধবের ধারার এক বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মাধবের বংশ বঙ্গীয় নবাবগণের

সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্মিলিত থাকায় উহাকে বল্লাল সেনের সময় হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গের অর্দ্ধ ইতিহাস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পুস্তক পাবনা টাউনের এক ক্রোশ উত্তরদিক্‌বর্ত্তী সিঙ্গা-নূরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের বাটীতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহার গতি কি হইয়াছে বলিতে পারি না।

অপর একটী কথা এই যে, বল্লাল সেনের অন্যতম মন্ত্রী ভৃগুনন্দীর পুত্রগণ মধ্যে কানু ও মাধব সম্ভবতঃ বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব-কালেই পোতাজিয়া গ্রামে বাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং পোতা-জিয়া গ্রাম অতি প্রাচীন পল্লী। হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়েও উহার অস্তিত্ব ছিল। আমি অতঃপর ক্রমে মূল মন্তব্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

লর্ড কার্জ্জন ও লর্ড এমথিল বাহাদুর যাঁহাদের রাজপ্রতিনিধিত্ব কালে বর্ত্তমান সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

পিতঃ আরল মিণ্টো বাহাদুর! তোমার জয় হউক। তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই যে, বর্ত্তমান সংখ্যা আমাদের সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের পাদপদ্মে উৎসর্গ জন্য লিখিত হইয়াছে। অন্তরের উৎসর্গ বাকি নাই। কিন্তু শ্রবণ করিতে পাই যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত সম্রাটের পাদপদ্মে কিছু উৎসর্গ করা যাইতে পারে না। অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা এই যে, যথারীতি অনুমোদনের প্রার্থনা করিলে অনুমোদন করিয়া কৃতার্থ করিও। পিতঃ! প্রায় শতাব্দী কাল গত হইল, তোমার পূর্ব্বপুরুষ লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মঙ্গল জন্যই আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ তোমাকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমার পূর্ব্বপুরুষ লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ফরাসী ও ওলন্দাজ ব্যতীত

কখনও ভারতবাসীকে জ্বালাতন করেন নাই। তুমি পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে ভারতবাসীর চিন্তার কোন কারণ নাই। সম্ভবতঃ সমস্ত জ্বালা ও যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে। পিতঃ! ভারতের প্রকৃত শান্তিদাতা হও। বিধাতার কৃপায় তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালে ভারতে প্রকৃত শান্তির সূত্রপাত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালের উল্লেখযোগ্য একটী বিশেষ দিন। যিনি যাহাই বিবেচনা করুন, কৃপাময়ীর কৃপায় উহা ইতিহাসে সময়ে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবেই হইবে। কার্জ্জনের অধিকার কালেই ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগে ছিলাম। কিন্তু উহা ভগবানের ইচ্ছা নহে, নতুবা তিনি কাল পূর্ণ না হইতেই ভারতের ন্যায় সোণার সিংহাসন হইতে অপসৃত হইলেন কেন? সে যাহা হউক তোমার রাজপ্রতিনিধিত্বের আরম্ভেই ভারতের degenaration (অধোগতি) বিনষ্ট হইয়া regenaration এর (ঊর্দ্ধগতির) সূত্রপাত হইতেছে। আমার আনন্দের আর সীমা নাই। এতদিনে অন্তরের আশার সাফল্য সম্ভাবনা হইতেছে। আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। পিতা মাতা জন্মদাতা বটেন; কিন্তু হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র পাঠে লোকের পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি নিশ্চয়। ভারতে নবজীবন বা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তির বীজ মহামেলাকালেই রোপিত হইয়াছিল। বিধাতার ইচ্ছায় এতদিন পরে অঙ্কুরিত হইল। নেত্রবিকার বশতঃ সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর না হইলেও প্রজ্ঞাচক্ষু সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মাগণ উহা অবশ্যই দেখিতে পাই-বেন। এখন উদ্যান-রক্ষকের যত্নে কণ্টক বিদূরিত হইলে উল্লেখিত অঙ্কুর শাখা ও প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক মহামহীরুহে পরিণত হইয়া শান্তির সুশীতল ছায়া প্রদান করিতে পারে। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল, জঞ্জালগুলি কাটিয়া শেষ করিলাম। এখন শান্তিতরু নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইলেই মঙ্গলের বিষয়। মহীপাল! তোমার শুভাদৃষ্ট ধন্য, যে হেতু

তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালেই ভারতে শান্তিতরু অঙ্কুরিত এবং প্রকৃত নবজীবনের সূত্রপাত হইতেছে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

পিতঃ মিণ্টো বাহাদুর! হিন্দু পরিবার, মহম্মদীয় পরিবার এবং Indian succession Act এর অধীন দেশী খৃষ্টান পরিবার প্রভৃতি Administration এর দোষে ভয়ানক কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনার বিশেষ ইচ্ছা নাই। অদৃষ্টের দোষে British administration দেশের জয়েণ্ট-ষ্টকসমূহকে without shareholder's council করিতেছে। সুতরাং ভারতের পরিত্রাণ নাই। রাজপুরুষগণ হিন্দু-ল, মহম্মদীয় ল এবং ইণ্ডিয়ান সাকসেসন্ আক্টের প্রভাবে সৃষ্ট জএণ্ট-ষ্টকের মেম্বর-দিগকে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা যথেচ্ছ বিচরণের অধিকার দিয়া ভাবিতেছেন স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার জন্যই ভারতে নরক গুলজার হইতেছে। এবম্বিধ কৌতুকাবহ ভ্রম আর দেখা যায় না। বিস্তারিত জানা ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বের সংখ্যা গুলি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভারতকে আমার লম্বোদরে পূর্ণ করিয়া রাক্ষসের গ্রাসে জীর্ণ করি নাই। বরং সিংহের সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় সেই ছিদ্রপথে a joint stock without shareholder's council the ruin is inevitable এই করুণ আর্ত্তনাদটী বহির্গত হইয়াছে। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম উল্লিখিত মর্ম্মকথাটী ভারতীয় Legislature (লেজিস্লেচার) গৃহে যতদিন বিশেষরূপে আন্দোলন ও আলোচনা না হইতেছে, ততদিন কোন-রূপেই ভারতের পরিত্রাণ নাই। উল্লিখিত বিষয়ে আন্দোলন, আলোচনা এবং পরিণামে সুমীমাংসা ব্যতীত প্রকৃতিপুঞ্জের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে এককালেই অসম্ভব। হায় রে! ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান বা দেশী খৃষ্টান প্রকৃতিপুঞ্জ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত

হইল। মহীপাল! যদিও ল অব প্রাইম জেনিচারের উচ্ছেদ ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি সম্ভাবনা নাই তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় মন্দের ভাল, যদি আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতেই ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ল অব প্রাইম জেনিচার এবং উহার আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত করিয়া হিন্দু, মুসলমান বা দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রকৃতিপুঞ্জের জাতীয় ধনাধিকার-ব্যবস্থা abolish (এবলিশ) করুন, আর যদি আমাদিগকে ভিন্ন ভাবে রক্ষা করাই আবশ্যক বিবেচনা হয়, তাহা হইলে The shareholder's of the joint stock companies must be under the share-holder's council এই ন্যায়সঙ্গত নীতি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরিবারগুলিকে systematic joint stock এ (সিস্‌টেমেটিক জএণ্ট-ষ্টকে) পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। শান্তি উপস্থিত হইবে। হিন্দু-ল, মহম্মদীয়-ল, ইণ্ডিয়ান সাকসেসন আক্ট এবং ল অব প্রাইম জেনিচার ইত্যাদির মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে কোন্‌টী অবলম্বন বাঞ্ছনীয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও আলোচনার যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে। উহার বিশেষ বিচার এবং আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর মঙ্গল নাই। ভারতেশ্বর! যদি বি. এন. রায়ের উক্তি পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা কর ও রাজত্বকাল উদাসীন ভাবে কাটাইয়া যাও, তাহা হইলে বুঝিতেছি যে, তোমার যশোভাগ্য নাই। পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিগণ যে উদাসীন থাকিবেন বা থাকিতে সক্ষম হইবেন বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখিতে পাইলেই সন্তুষ্টির কারণ হইবে। ভারতেশ্বর! পদাশ্রিত ত্রিশকোটী মানব রসাতলে যাইতেছে। কৃপাবলোকনপূর্ব্বক রক্ষা করুন।

হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান পরিবারের প্রত্যেক আশ্রম গৃহটী আপন আপন চতুঃসীমার মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব। সন্ধি, বিগ্রহ, শাসন ও পালন ইত্যাদি সমস্তই উহাতে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু রাজার রাজত্বই পরিবাররূপ রাজত্বের প্রাণ স্বরূপ। আমাদের ভাঙ্গা কপালের দোষে আমাদের রক্ষক এবং পালক রাজরাজেশ্বর পরিবাররূপ রাজত্বের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়াছেন ও করিতেছেন। হিন্দু-ল, মহম্মদ-ল আদি প্রচলিত রাখিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় পরিবার প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে আবার ঘোরতররূপে বিড়ম্বনা প্রদান করিতেছেন কেন? হায় রে! রাজ্যেশ্বরের এই কৌতুকাবহ ভ্রম কি কিছুতেই অপনোদন হইবে না? সভ্যতার আদিম অবস্থায় স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের দুরাশা এবং অত্যাচার নিবারণ জন্যই ক্রমে দল ও দলপতির সৃষ্টি; পরিণামে প্রধান প্রধান দলপতিগণই রাজপদের সৃষ্টি করিয়া অধিকার করিয়াছেন। রাজা ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া থাকা হেতুই প্রকৃতিকুল আত্মকৃত যত্নের ফল ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয়। স্বার্থান্ধ কেহ অন্যকৃত যত্নের ফল হরণ করিতে পারে না। সমদৃষ্টিতে প্রজার ন্যায়ানুগত স্বার্থ রক্ষাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। ইংরেজ-রাজের বিবেচনার ত্রুটী ও প্রশ্রয় হেতু পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি দৃঢ়তররূপে অধিকার করিয়াছে এবং করিতেছে। সুতরাং আমাদের শান্তির লেশ মাত্র নাই। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিবার-দেহে সাংঘাতিক রোগ স্বরূপ। উহার প্রভাবে পরিবাররূপ রাজত্বে রাজার সহিত প্রকৃতিপুঞ্জের বিদ্রোহভাব কেবল মাস বর্ষ নহে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর কাল সমভাবেই বিরাজ করিতেছে। অতএব শান্তির অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? রাজবিধির প্রভাবে সৃষ্ট হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক পরিবার এক একটী জএণ্ট-ষ্টক হইলেও উহার অংশীদারগণ অংশীদারসভার আনুগত্যবিহীন হইয়াছে, প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-রোগগ্রস্ত এক একটী অদ্ভুত জীব হইয়াছেন। রাজপুরুষদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবলম্বন না করিলে পদে পদেই ঠকিতে হয়, আবার এদিকে

জএণ্ট-ষ্টকের মেম্বর হইয়া পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বিপথে ভ্রমণ হেতু সর্ব্বনাশ নিশ্চয়। আমার কথায় যাঁহার অশ্রদ্ধা করিতে হয় করুন; কিন্তু বিপথে ভ্রমণে মঙ্গল হয় ইহা কখনই সিদ্ধান্ত বা স্বীকার করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা administration এর গুরুতর দোষ আর কি হইতে পারে? কর্ম্মকাণ্ডে জীবের আহার; সর্ব্বাগ্রে যদি প্রকৃতিপুঞ্জের আহারের মূল বিনষ্ট হইল, তবে সর্ব্বনাশের আর বাকি কি থাকিল! আরল মিণ্টো বাহাদুর! সবিশেষ সূক্ষ্মরূপে বিচার ও আলোচনাপূর্ব্বক আমাদের অন্নমূল সংশোধন করিয়া রক্ষার পথ উন্মুক্ত করুন। পিতঃ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতেছি।

পাঠকবৃন্দ! জগত্তারিণী জগদম্বার নাম স্মরণপূর্ব্বক আমি অতঃপর ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছি।

খাম্বাজ—একতালা।

"নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষিণী।
নীলনলিনী যিনি ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী॥
নিরমল নিশাকর-কপালিনী নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী।
নৃকর চারুতর সুশোভিনী লোলরসনা করালবদনী॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূলছাল নীলপদ্ম করে করি করবাল।
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী॥
নিপতিত পতি শবরূপে পায় নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায় নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥"

মহারাজা শিবচন্দ্র।

যে সময়ে নবাব হাজি ইলিয়সের পৌত্র সুলতান গয়েসউদ্দিন পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ-নির্ম্মাতা আপন পিতা সেকেন্দর

সাহকে নিধন এবং নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের চক্ষু উৎপাটন করিয়া নবাবী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকাল বঙ্গদেশের পক্ষে বিশেষ দুর্দ্দিন। সুলতান গয়েসউদ্দিন সুশাসকরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বঙ্গে কিছুকালের জন্য ঘোর অবসন্ন দশা উপস্থিত হইল। উল্লিখিত সময়ে দিল্লির বাদসাহ হীনপ্রতাপ এবং বঙ্গীয় নবাবের পশুশক্তিও ক্রমেই হীন দশা প্রাপ্ত হইতেছিল। দিনাজপুরের অন্তর্গত বিঠুরের হিন্দুরাজা গণেশ বলপূর্ব্বক নবাবী সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার পৌত্রের রাজ্যভোগের পরে ক্রীতদাস ও হাবসিগণ অনায়াসে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং অল্পকাল মধ্যেই কতকগুলি নবাবের পরিবর্ত্তন হইল। ইতিহাসে উপর্য্যুপরি ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখা গেলে, রাজকীয় পশুশক্তির বিষম দৌর্ব্বল্যই প্রতীয়মান হয়। কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে পশ্বাচার শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রভা কোন নৈসর্গিক কারণে হীনদশা প্রাপ্ত হওয়ায় বীরাচার নামে অভিহিত কামচর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। তাহারা শুক্রসাধন বিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক শাস্ত্রের সদুদ্দেশ্য ভুলিয়া সমাজের বিশেষ উপদ্রবকারী হইয়াছিল। বঙ্গসমাজ ছারখার ও অধঃপাতে গিয়াছিল। দেশ মধ্যে ধর্ম্ম, নামে ব্যতীত কার্য্যে একপ্রকার ছিল না। রাজা গণেশের পুত্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। শান্তির হেতু রাজা, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সমস্তই যেন কোন বিষম কালকূটে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা দেশমধ্যে এক প্রকার বন্দ হইয়াছিল। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র নানাপ্রকার

এবং ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, উহাকে মনুসংহিতা তাহাকে হারীত সংহিতা এবং অমুককে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে ব্যবস্থা দিয়াছি; গতিকেই ব্যবস্থা একপ্রকারের হয় নাই। এবম্বিধ উক্তিতে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা বিশেষরূপেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমস্ত দেশ মহাবিপ্লবের দশায় পতিত হইয়াছিল; ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায়, এই মহাবিপ্লবের সূত্রপাতে নবদ্বীপে বাসুদেব শর্ম্মা নামক একটী ব্রাহ্মণকুমার জন্মগ্রহণ করেন। * বয়ঃক্রম ছয় বৎসর অতীত না হইতেই নবদ্বীপস্থ কোন টোলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। অধ্যাপক মহাশয় তামাক সেবনের ইচ্ছা প্রযুক্ত একদিন নিকটস্থ শিশু ছাত্র বাসুদেবকে অগ্নি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। বাক্য পূর্ণরূপে নিঃসারিত হইবার পূর্ব্বেই শিশু বাসুদেব অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটিলেন এবং অধ্যাপক-পত্নীকে উননের বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া গুরুর অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্ব্বক কিছু অগ্নি প্রার্থনা করিলেন। অধ্যাপক-পত্নী একাগ্রচিত্তে নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বাক্যশ্রবণমাত্র একহাতা অগ্নি তুলিয়া বলিলেন, বাবা এই লও। ছয় বৎসরের শিশু বাসুদেবের পূর্ব্বে একবারও চিন্তা হয় নাই যে, অগ্নি গ্রহণের জন্য কোন পাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে। গুরু-পত্নীর বাক্য নিঃসারিত হইবামাত্রই বালক নিজ অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে নিকটস্থ ধূলিতে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া গুরু-পত্নীকে বলিলেন, মাতঃ! অগ্নি প্রদান করুন। অধ্যাপক-পত্নী বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া অগ্নি প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং আনন্দে

* ঘটনার চক্রে নবদ্বীপতত্ত্ব পূর্ণরূপে অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, সুতরাং আশার তৃপ্তি হয় নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি এই দুইটী চরিত্রের কোন কোন কথা উল্টা পাল্টা হইয়াছে কি না, মনে সংশয় রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংস্কারের ইচ্ছা থাকিল।

গদ্গদ হৃদয়ে অবিলম্বেই সমস্ত বিষয় আপন পতির নিকট জ্ঞাপন করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, এই ছাত্রকে দর্শন-বিদ্যা শিক্ষা দিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। অতএব তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে বালককে দর্শনোপযোগী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শন-শিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে বাসুদেব ন্যায় দর্শন শিক্ষা মানসে মিথিলায় গমন করিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে মিথিলাই সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন আর শুষ্ককাষ্ঠ চর্ব্বণ অনেকাংশে তুল্য। মুখস্থ করা বড়ই কঠিন। দশ বিশ বার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেও পাঁচটী পংক্তির তাৎপর্য্য স্মরণ রাখা অসাধ্য হইয়া উঠে। মৈথিল পণ্ডিতগণ বৈদেশিক ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু কাহাকেও পুস্তক নকল করিয়া লইতে দিতেন না। গতিকেই বিদেশী ছাত্রগণ বাটী প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সূত্রই ভুলিয়া যাইত। পল্লব-গ্রাহীর ন্যায়, যদিও দুই চারিটি মুখস্থ থাকিত, তাহাতে বিশেষ কোন কার্য্য হইত না। মৈথিল পণ্ডিতগণ এবম্বিধ অসদুপায় অবলম্বনে আপন দেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে বর্ত্তমান কালের ন্যায় পুস্তকপ্রাপ্তির সুবিধা না থাকায় বিদ্যার্থীদিগকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। বাসুদেব মৈথিল পণ্ডিতদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং মনের ভাব গোপন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন করাই সংকল্প করিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালীর এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি নবদ্বীপে পঁহুছিয়া ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। পরন্তু একটী টোল সংস্থাপন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে উহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গুরুর নিকট 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক রঘুনাথ

শিরোমণি এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্যদেব এই দুইটী মহাপুরুষই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন।

সংসার পাপভারাক্রান্ত হইয়া মহাবিপ্লবগ্রস্ত হইলে লোকে যখন নিরন্তর পরিত্রাহি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তখনই ঈশ্বরের কৃপায় বা নৈসর্গিক নিয়মে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া মহাবিপ্লবের মূলোচ্ছেদ ও শান্তি আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মের সংস্থাপন, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্ক্রিয়াসক্তদিগের দমন করেন। এই সকল ব্যক্তির প্রতিভা অসাধারণ। প্রতিভার দিকে নিরীক্ষণ করিতে হইলে চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। আত্মবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই পুরুষ বা চৈতন্য বটে, কিন্তু ইহাঁরা মহাপুরুষ বা মহাচৈতন্য। এই সমস্ত মহাপুরুষ বা মহাচৈতন্য ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে ভক্ত বা শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরম পিতার আংশিক বা পূর্ণাবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আংশিক অবতারদিগকে কেহ কেহ ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ বলেন। যিনি সাধারণ অবতার হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, ভক্তের প্ররোচনায় তিনি ঈশ্বরের পূর্ণাবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এস্থলে ভক্তির জয় ব্যতীত তর্কশাস্ত্রের জয় নাই! বঙ্গের পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের সূত্রপাতে নবদ্বীপে সার্ব্বভৌম মহাশয়ই প্রথম অবতীর্ণ হন। অব্যবহিত পরে নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য, লোকপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি কতকগুলি শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাপুরুষ কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নবদ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং শুভ সম্মিলন হেতুই পতিত বঙ্গভূমির উদ্ধার হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভক্তগণ নবদ্বীপের দ্যুতিমান্ মহাপুরুষ শচীনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবকে ভগবানের পূর্ণাবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অন্যান্য সকলে সেই মহাচৈতন্যের নিজগণ বা সঙ্গোপাঙ্গ

মাত্র। ইহাঁদের আবির্ভাবের পর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মহাবিপ্লব এককালেই বিদূরিত এবং বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটদিগের অধিকৃত হওয়ায় রাজশক্তিরও চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত, তাহাতে সেই প্রাচীন বিপ্লবের একটী ইতিহাস সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে, সমাজের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার সেই প্রাচীন বিপ্লবের ইতিহাস বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। পরন্তু সমস্ত ভারতের পক্ষেও উহা নিতান্ত সামান্য উপকার নহে। সে যাহা হউক, উল্লিখিত মহাবিপ্লবের ইতিহাস লিখিতে হইলে উক্ত মহাপুরুষ-দিগের কার্য্য ও জীবনী বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হয়। ক্ষীণ মস্তিষ্কবিশিষ্ট মাদৃশ লোকের আপাততঃ ঐ সকল গবেষণা ও অনুশীলন করা বিশেষ কঠিন। তথাপি দেশের বিশেষ উপকারপ্রত্যাশায় সেই সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ও উল্লিখিত মহাপুরুষচরিতের দুই চারি কথা যাহা অবগত আছি, সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইব। উহা দ্বারা আমাদের অধোগতির নিবৃত্তি হইয়া ঊর্দ্ধগতির সূত্রপাত হইলেই বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে।

প্রথমতঃ পূজনীয় রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং তাঁহার প্রিয়ছাত্র রঘুনাথ, ইহাঁরা উভয়েই জ্ঞানরাজ্যে আশ্চর্য্য অবতার স্বরূপ। জ্ঞান বা দর্শন-শাস্ত্রই শাস্ত্র মধ্যে আলোক-শাস্ত্ররূপে পরিগণিত। উক্ত আলোকের সাহায্য ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের গুহ্যতম অংশ উৎকৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য সংসারে নানাপ্রকার অপলাপ দর্শন করে। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, পদার্থের অপলাপ দর্শন বিনষ্ট হইয়া প্রকৃত ভাবের দর্শন হয়, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র কহে। যে অণু চর্ম্মচক্ষে ঈক্ষণ করা যায় না, দর্শনের সাহায্যে উহা অন্তরে স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। এতাবতা কেহ কেহ দর্শন

শাস্ত্রকে আন্বিক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া থাকেন। দর্শন বা আন্বিক্ষিকী বিদ্যার নামান্তর জ্ঞানশাস্ত্র। প্রোক্ত গুরু ও শিষ্য বঙ্গদেশে জ্ঞানরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় মিথিলা প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন ও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে মিথিলায় গমন করেন। মৈথিল পণ্ডিতগণ, যে প্রণালীতে স্বদেশে ন্যায় শাস্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রধান অধ্যাপক দূরে থাকুক, তাঁহাদের ছাত্রদিগের সহিত বিচারেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইতেন। ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে মিথিলাবিজয়ী পণ্ডিতই সেই সময়ে ভারতবিজয়ী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালীর ছাত্র অদ্ভুত প্রতিভাশালী রঘুনাথের সহিত বিচারে ন্যায়ের ছাত্রগণ সহজেই পরাস্ত হইলেন। পরিশেষে তদানীন্তন মিথিলাপ্রদেশস্থ ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক, দারভাঙ্গা ও ত্রিহুত্ রেলওয়ের বাঢ় নামক ষ্টেসনের অদূরবর্ত্তী বাজিতপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র মহাশয়ও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। রঘুনাথের বিজয়বার্ত্তা ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তখন দলে দলে ন্যায়-শিক্ষার্থী ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহাত্মা রঘুনাথ কর্ত্তৃক নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের জ্ঞানরাজ্যে ভ্রমণের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তিনি ন্যায় শাস্ত্রের দুরূহ অর্থের বোধসৌকর্য্যার্থে "চিন্তামণি দীধিতি" নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। রঘুনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পরও অনেকানেক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে নবদ্বীপ অদ্যাবধিও এক প্রধান স্থানরূপেই পরিগণিত

আছে। সুতরাং নবদ্বীপ বাঙ্গালী জাতির জ্ঞানগৌরবের স্থান সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা বলিতেছি। ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রঘুনাথ শিরোমণি এবং চৈতন্য দেবের সমসাময়িক, কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র নহেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় রঘুনন্দন সর্ব্বসাধারণের নিকট 'স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি সমাজের অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাস ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। এক অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমাকে মনু সংহিতা, তাহাকে হারীত সংহিতা ও অমুককে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে ব্যবস্থা দিয়াছি, ইত্যাকার উক্তি অজ্ঞ সাধারণের পক্ষে কোনরূপেই প্রীতিকর হইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস এইরূপে লোপ পাইতেছে দেখিয়া উহা দুরীকরণমানসে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থনপূর্ব্বক দায়তত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, আহ্নিকাচার-তত্ত্ব ইত্যাদি অধ্যায় ভেদে 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' নাম দিয়া এক খণ্ড স্মৃতি-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মসাধনের একটী সুগম পন্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। যদিও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গোস্বামিগণ শাক্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা সর্ব্বতো-ভাবে শিরোধার্য্য করা কষ্ট ও লজ্জাজনক বিবেচনা করিয়া 'হরিভক্তি-বিলাস' নাম প্রদানপূর্ব্বক আরও একখণ্ড স্মৃতি-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের ব্যবস্থার সহিত স্থলবিশেষে সামান্য অনৈক্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বঙ্গের কর্ম্মকাণ্ড বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায়ই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত ব্যবস্থানুসারেই চলিতেছে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা নহেন, একজন সংগ্রহকার মাত্র। কিন্তু তৎকৃত সংগ্রহই বঙ্গের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিগণিত আছে।

স্মার্ত্তসংগৃহীত ব্যবস্থাসমূহের অংশবিশেষের প্রতি দোষারোপ করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে দেশের একজন অনিষ্টকারী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অদ্ভুতপ্রতিভাবলে অধঃপতিত ও মহাবিপ্লবগ্রস্ত প্রাচীন বঙ্গসমাজের কর্ম্মকাণ্ডের রক্ষা এবং উদ্ধার হইয়াছিল, আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এবম্বিধ অনুযোগ করা অনুচিত। স্মৃতিশাস্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের অযোগ্য, আর কতকগুলি কাল, দেশ বা পাত্র অনুসারে পরিবর্ত্তনার্হ হইয়া থাকে। স্মার্ত্তসংগৃহীত ব্যবস্থাগুলি তাঁহার সময়ে কাল, দেশ বা পাত্রগত অবস্থার বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। নতুবা সমগ্র বঙ্গদেশ উহা সাদরে শিরোধার্য্য করিবে কেন? বর্ত্তমান সময়ে যদি কাল, দেশ বা পাত্রগত কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা সম্পাদিত না হওয়া জন্য বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতবর্গই দায়ী। তজ্জন্য সেই স্বর্গগত মহাপুরুষকে কখনই দায়ী করা যাইতে পারে না। হিন্দু বাঙ্গালী কি ছিল, কি হইয়াছে এবং কি হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় যাঁহারা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বিশেষ যত্নের সহিত টীকা ও অনুবাদ সহ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব এবং হরিভক্তি-বিলাস পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে প্রকৃত বিষয় উৎকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। *

তৃতীয়তঃ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলিতেছি। রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের সমকালেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নিজ সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত

* বর্ত্তমান সময়ে সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারিগণ নাম মাত্র মূল্য গ্রহণ করিয়া নানা উপাদেয় গ্রন্থ গ্রাহকদিগকে উপহার দিতেছেন। কোন মহাত্মা সটীক ও সানুবাদ বিশুদ্ধ সংস্করণ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব এবং হরিভক্তি-বিলাস উক্ত প্রকারে উপহার দিলে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে।

নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র বীজ ভক্তবৃন্দের হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে 'বীরাচার' নামে অভিহিত কামচর সম্প্রদায় তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সাহায্যে শুক্রসাধন ও কাম-তত্ত্বের নানা অঙ্গ শিক্ষা করিত। কিন্তু প্রকৃত পথ ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপথে ধাবিত হইয়াছিল। অপিচ সমাজের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া কুল-ললনাদিগকে পথভ্রষ্ট এবং ধর্ম্মে নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর কন্যা ও বধূ প্রভৃতি লইয়া নিরুপদ্রবে বাস করা কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। কোন অজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণে দেশের পশ্বাচার শাক্তশক্তি এবং রাজ্যেশ্বরের মহান্ রাজশক্তি হীনদশা প্রাপ্ত হওয়ায় দুরাচারদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং উল্লিখিত কামচর সম্প্রদায় অসঙ্কোচে আপন দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিত। এবম্বিধ মহাবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় দেশের লোক যখন বিষম প্রমাদ গণিয়া হা হতোস্মি করিতেছিল, সেই সময়েই নিষ্কাম কুলতিলক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নিজ সঙ্গোপাঙ্গের সহিত নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া উল্লিখিত লোমহর্ষণকর অত্যাচার হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভগবান ধর্ম্মরক্ষা ও সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। উল্লিখিত মহাবিপ্লব হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিয়াই মহাপ্রভু বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভগবানের অবতাররূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর জন্ম নবদ্বীপের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। সমস্ত বঙ্গের পক্ষেও বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের নিকট তিনি Lord গৌরাঙ্গ। আহার নিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম সকল মনুষ্যেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু প্রতিভার বল সকলের সমান নহে। যাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে পাপভারাক্রান্ত ও

মহাবিপ্লবগ্রস্ত সমাজ শান্তিপথে প্রয়াণ করে, তাঁহারা সমাজের মহাগুরু। যাঁহাদের উচ্চ কীর্ত্তি-চূড়ার দিকে দৃষ্টি করিলে চর্ম্মচক্ষুর ধাঁধা লাগিয়া যায়, ভক্তগণ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান না করিয়া ভগবানের অংশ বিশেষ বা অবতার কল্পনা করিলেই বা দোষ কি? ভারতে এবম্বিধ অবতার-কল্পনার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষেই অসাধারণ। তিনি মনুষ্যাকৃতি হইলেও দেবতা-নির্ব্বিশেষ। তাঁহার ন্যায় তেজ ও প্রতিভা সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব হয় না। যাঁহার আবির্ভাবে তদানীন্তন কালের তমসাবৃত ও মহাবিপ্লবগ্রস্ত সমাজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাষিত হইয়াছিল। তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বিশেষ বা অবতার কল্পনা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। নবদ্বীপের উজ্জ্বলতম রত্ন, কলির অবতার স্বরূপ শচীনন্দন মহাপুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে প্রণাম করিতেছি। চৈতন্যদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান বঙ্গভাষার মূল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরও কিছুদিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোত দেশ মধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। অনেকানেক শাক্তসন্তান বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানকালে উক্ত স্রোতের আর ততদূর প্রাবল্য নাই।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বঙ্গদেশে যে সকল মহাপণ্ডিত ও মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে নবদ্বীপের ৬ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক আর এক ব্যক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি কোন্ শ্রেণীর উপাসক বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাঁর সহোদরও কিছুই জানিতেন না। কাল সহকারে সমস্ত প্রকাশিত হয়। ইনি আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণ প্রতিবৎসর দীপান্বিতার

সময় আগমবাগীশের সংস্থাপিত আগমেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণের সাহায্যে ভোগের অন্নক্ষেত্র হইয়া থাকে। নবদ্বীপের উল্লিখিত মহল্লা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আগমেশ্বরীর পাড়া নামে খ্যাত আছে। আগমবাগীশ মহাশয় রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতির সমসাময়িক নহেন। অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পরকালবর্ত্তী। বৈদিক দীক্ষা ও শিক্ষা ইত্যাদি কেবল দ্বিজদিগের সম্বন্ধেই উক্ত; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে দ্বিজ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই দীক্ষা ও শিক্ষা হইতে পারে। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্র-শাস্ত্রের একটা সার-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে "কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার" নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রচার করায় তিনি আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ হন। এই তন্ত্রসারের পদ্ধতি ও প্রকরণ অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে অধিকাংশ স্থলে দীক্ষা, শিক্ষা, যজ্ঞ, পূজা, হোম, পুরশ্চরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হয়। উহার সাহায্যেই আবশ্যকীয় যন্ত্র ও কবচ ইত্যাদির রচনা চলিতেছে। সুতরাং আগমবাগীশ মহাশয়ও প্রাচীন সংস্কারকদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। জাহ্নবী সলিল বিধৌতা ও পরিবেষ্টিতা নবদ্বীপ উপরোক্ত মহাপুরুষদিগের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই শ্রীধাম নামে খ্যাত হইয়াছে।

হিন্দুরাজত্বকালে নবদ্বীপ বঙ্গের রাজধানী ছিল। ঘটনার চক্রে পশুরাজ আপন রাজপাট অন্যত্র উঠাইয়া লইলেও হিন্দুর জ্ঞান-রাজত্বে অতি প্রাচীন কাল হইতে নবদ্বীপ বঙ্গে আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ভাবেই রক্ষা করিয়া আসিতেছে। রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির তিরোভাবের পরও অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। নবদ্বীপে হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ উচ্চ-শ্রেণীর পণ্ডিতের সংখ্যা অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনায় অদ্যাপিও কম নহে। বর্ত্তমান সময়ে নবদ্বীপে ন্যূনাধিক এগার বা বারশত ঘর

ব্রাহ্মণের বাস আছে। তন্মধ্যে প্রায় এক হাজার ঘর শাক্ত এবং অবশিষ্ট বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইবেক। বঙ্গের বহুপল্লী এতাদৃশ অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস বলিয়া গর্ব্ব করিতে অসমর্থ। পোড়া মা নবদ্বীপের প্রাচীন অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্যদেবতা। তিনি উল্লিখিত ধামে সংস্থাপিত অন্যান্য বিগ্রহ সমূহকে প্রাচীনত্বে অতিক্রম করিয়াছেন। পোড়া-মা, মুসলমান অধিকারের বহুপূর্ব্বে সংস্থাপিত। রঘুনাথ, মহাপ্রভু, রঘুনন্দন প্রভৃতি সকল মহাত্মাই তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্থানীয় প্রথা অনুসারে হিন্দুদিগের বিবাহ অন্নাশন ও চূড়াকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শুভকার্য্যে ক্ষুদ্র বা বিশেষ উপচারে অগ্রে পোড়া-মার পাদপদ্মে পূজা দিতে হয়। পোড়া-মার প্রাঙ্গণই নবদ্বীপবাসীদিগের সম্মিলনের সর্ব্বপ্রধান স্থান।

শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা এবং মূর্ত্তিবিশিষ্ট স্থাপিত নানা বিগ্রহে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ। অপিচ গৌরচন্দ্র এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ দলের মূর্ত্তিও বহুল পরিমাণে সংস্থাপিত আছে। পোড়া-মার মন্দিরের পশ্চিম দিক্ দিয়া নবদ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করত যে বৃহৎ পথটী উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, উহার পূর্ব্বাংশে বৈষ্ণব এবং পশ্চিমাংশে অধিকাংশ শাক্ত সম্প্রদায়ের বাস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পোড়া-মার মন্দির পূর্ব্ব খণ্ডে আর মহাপ্রভুর মন্দির পশ্চিম খণ্ডে অবস্থিত আছে। যে স্থান উল্লিখিত বিগ্রহসমূহের ঘণ্টা ও কাঁসরাদির নিনাদে সর্ব্বদাই আমোদিত, জাহ্নবী যাহার তলবাহিনী হইয়া সর্ব্বদা পাপ ধৌত করিতেছেন, যে স্থান বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের চরণরজঃস্পর্শে সর্ব্বদাই পবিত্র হইতেছে এবং যে স্থানের মহিমাবলে প্রাচীন বঙ্গসমাজের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র ভূমিতে এই সংখ্যার উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নবদ্বীপেই অত্র সংখ্যার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। মৃত্তিকার গুণে সুফল কিছু না কিছু অবশ্যই ফলিবে।

সম্প্রতি দেব, ব্রাহ্মণ এবং পিতৃলোককে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। ভরসা করি তাঁহাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে শাক্তসন্তানের কামনা এইবার সফল হইবে।

পাঠকবৃন্দ পূর্ব্বলিখিত সংখ্যাগুলি Theoretical (থিওরেটীক্যাল্) ব্যতীত Practical (প্রাকৃটীক্যাল্) হিন্দুত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। যদিও শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ পালনই প্র্যাকৃটিক্যাল্ হিন্দুত্ব বা হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ড, তথাপি মর্ম্ম বুঝিতে হইলে অজ্ঞ সাধারণের পক্ষে কেবল উহাই যথেষ্ট নহে। ভাই পাঠকেরা যদিও সকলে জানেন না, তথাপি হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র প্রথম পাঁচসংখ্যা একত্রে পুস্তকাকারে ২য় সংস্করণ প্রকাশকালে একটী মন্তব্য লিখিয়া প্র্যাকৃটিক্যাল্ হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আরও একটী সংখ্যা লিখিতে এবং সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড বাহাদুরের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। বাহুল্য বর্ণনা আমার অভ্যাস নাই। নিম্নে সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়টী আলোচনা করিতেছি। ভারতের মলাপকর্ষণ জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি। যে যে অংশের মলাপকর্ষণ অর্থাৎ সুইপিং এ যাত্রায় আবশ্যক বোধ হইল তাহা শেষ করিলাম। ভরসা করি, ভারত এইবার বল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে। পশুবধ শাক্তসন্তানের নিত্যকার্য্য। নিম্নলিখিত অধ্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরোক্ষভাবে প্রকাণ্ড পশুবধের সহায় হইবে। প্রকাণ্ড বা অপ্রকাণ্ড পশুত্ব বিনষ্ট হইতেছে, পাঠান্তে পাঠক অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এবারে সুইপিং মূলকর্ম্ম হওয়ায় প্রকাণ্ড পশুবধ প্রবন্ধে ইহার নাম Sweeping (সুইপিং) পর্ব্ব রাখাই সঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

ভাই পাঠক! বিগত দিল্লী-দরবারে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের অভিষেকবার্ত্তা ঘোষণার দিনে তাঁহার ও ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলকামনায় নবদ্বীপেশ্বরী পোড়া-মার পাদপদ্মে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি

দিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মা অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। "জগত্তারিণী জগদম্বে ত্রাহি মাং শরণাগতং।"

জয় পোড়া-মাতঃ! নবদ্বীপেশ্বরি! তাপিত তনয়ে তর৷ মা তারা!
জানি না পূজন জয় যোগেশ্বরি! ভারতে তার মা মহেশদারা॥
জ্ঞানী বাসুদেব আর রঘুনাথ শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি ভবে।
আগমবাগীশ চৈতন্য নিতাই পূজিল তোমার চরণ সবে॥
হইলা কৃতার্থ তাঁরা মহাজন মহিমার গুণে ঈশানি বামা!
শীতল জানিয়া শরণ লয়েছি স্থান দে যুগল- চরণে শ্যামা॥
মহাজন তরে আপনার গুণে তাঁসবে তারিলে মহত্ত্ব কোথা।
অভাজনে তার প্রচারি মহিমা পতিত তনয় যাইবে কোথা॥
লয়েছে আশ্রয় চরণে সন্তান ঠেলোনা অভয়া অভাগা বলে।
থাকিতে সন্তান দীনদয়াময়ি! ভারত ডুবিল অতলতলে॥
কারে কব ব্যথা শাক্তের তনয় মহাশক্তিপূজা করিনু কবে।
কৃপা কি করিবে? জগত জননি পূরে যাবে বিশ্ব দয়ার রবে॥
পূজে ছিল বঙ্গ পাঠানরাজত্বে মহাজন মেখে অঙ্গনমাটী।
জবা-বিল্লদলে চরণ পূজিল তবে ত বাঙ্গলা হইল খাঁটী॥
জবা-বিল্লদলে গঙ্গাজল সহ পূজেছি চরণ করুণাময়ি।
করুণা করিও পাষাণতনয়া ভরসা কেবল আনন্দময়ি॥
শুধু বঙ্গ নহে সমস্ত ভারত এবার ঈশানি তারিতে হবে।
শ্যামা! তব দাস হইলে বিফল তারিণী নামেই কলঙ্ক রবে॥
অধম সন্তান ভজন জানি না ডাকিতেছি কালি কাতরস্বরে।
অপর্ণে অম্বিকে! জয় অম্বালিকে! বিজয়ী হইব তোমার বরে॥
করোনা বঞ্চনা কালি কাত্যায়নি! "দেহি মে" চরণ জগতে সার।
যাহার আশ্রয়ে ক্ষুদ্রতম আমি অকূল সাগরে হইব পার॥

জয় জয় জয় পোড়া-মার জয় পার্ব্বতি বিজয়া শঙ্করি শিবে।
বিদগ্ধ ভারতে পতিতপাবনি! নিরমল শান্তি সুধা কি দিবে?
বরাভয়দাত্রী ব্রহ্মাণ্ডে পূজিতা কলুষনাশিনী কালিকা তুমি।
বরাভয়দানে কর মা উদ্ধার প্রতীচ্যসঙ্কটে ভারতভূমি॥
আমি ঝাড়ুদার তব আঙ্গিনার দুহাতে কাটিব যে কিছু মল।
দয়াময়ি দুর্গে কৃপায় পাইবে ভারত এবার অমিত বল॥
বিদগ্ধজননি! বিদগ্ধ সন্তান যাচে মাগো! তোর চরণবল।
পবিত্র হইব পবিত্র করিব ভারতে ঢালিব শান্তির জল॥
জাগ মা কালিকে! কুলকুণ্ডলিনি! হৃদয়ে ভবানী বাঁধিব বল।
স্তম্ভিত মুগধ মর্ত্ত্যলোকবাসী দেখুক চরণ- পূজার ফল॥
"বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥"

"বরদা যদি মে দেবি দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।"

প্রকাণ্ড পশুবধ (সুইপিং পর্ব্ব)

যদিও পতিত "পৃথিবীর গুরু" ভারত জননি! কেঁদ না আর।
বরদা শুভদা কুলকুণ্ডলিনী অবশ্য সন্তানে করিবে পার॥

আপন আপন জীবনকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য প্রত্যেক জীবের যন্ত্র আছে, উহাকে জীবন-যোনি যন্ত্র কহে। জীবন-যোনি যন্ত্র নিবন্ধন দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদি বিধাতাপুরুষ উল্লিখিত ক্ষয়-নিবারণের উপায় সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে দেহ অবিলম্বেই ধ্বংসমুখে পতিত হইত। যাঁহার বিধানে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছাপ্রভাবে সেই ক্ষয়নিবারণের উপায়ও সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত উপায়কে আহার কহে। আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিলেই উহা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ (শ্লেষ্মা) এই তিনটী পদার্থের সাহায্যে

জঠরাগ্নি কর্ত্তৃক পরিপক্ক হয়। পরিপাককার্য্যে পিত্তরসের সাহায্যই সর্ব্বপ্রধান। পরিপক্ক দ্রব্যের সারাংশ অর্থাৎ (আরক) যাহা দেহের ক্ষয়পূরণ জন্য গৃহীত হয়, তাহাকে রস কহে এবং অসার অংশ যাহা পরিত্যক্ত হয় তাহা মল-মূত্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাত সাত দিনে পারম্পর্য্য ক্রমে রস হইতে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই কয়টী ধাতু উৎপন্ন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতুর পূরণ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেহধারণের জন্য আহার জীবের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। আহার্য্যের অসার অংশ, মল-মূত্রাদি এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নানা মলের সংযোগ হইতে দেহকে মুক্ত করা আরও একটী অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্ম। শাস্ত্রকর্ত্তারা উহাকে নির্হার ধর্ম্ম বলিয়াছেন। উপরোক্ত শুক্র ধাতুর ব্যয় বা ক্ষয়ও একটী বিশেষ ধর্ম্ম। শাস্ত্রকর্ত্তারা উহাকে বিহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আহার, নির্হার ও বিহার এই তিনটীই জীবের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। প্রায় যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড উহার অন্তর্গত বা আনুসঙ্গিক। যদিও সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বিবিধ নামে আরও একটী অধ্যায় কল্পনা করিতে হয়, তথাপি আহার, নির্হার ও বিহার এই তিনটীই কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান অধ্যায়। উল্লিখিত অধ্যায়গুলি আবার গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা;—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। বিধিবিহিত বা বৈধ কর্ম্ম আবার তিন ভাগে বিভক্ত; যথা,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। প্রথমতঃ প্রধান কর্ম্ম আহারের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফের সাহায্যে আহার্য্য পদার্থ পরিপক্ক হয় বটে, কিন্তু কোন কারণে উহারা বৈষম্য দশা প্রাপ্ত হইলে পরিপাক ক্রিয়া উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন এবং আবশ্যকীয় রস-রক্তাদি জন্মিয়া দেহের পোষণ হয় না; সুতরাং শরীরে নানা প্রকার গ্লানি বা ব্যাধির পূর্ব্বরূপ উপস্থিত

হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফের সাহায্য ব্যতীত আহার্য্য পরিপাক হইয়া দেহের রক্ষা ও পোষণ হয় না; পক্ষান্তরে উহারা কোন কারণে বৈষম্য দশা প্রাপ্ত হইলেও পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া দেহের রক্ষা এবং পোষণ হয় না। এজন্য প্রাচীনেরা বায়ু, পিত্ত ও কফকে দেহের অভ্যন্তরস্থ মল বা দোষ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিথ্যা অর্থাৎ ন্যায়-বিরুদ্ধ আহার, বিহারাদি দোষের প্রকোপ বা বৈষম্যপ্রাপ্তির কারণ; অতএব মিথ্যা আহার ও বিহারাদি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

আহার, নির্হার ও বিহার প্রভৃতি ধর্ম্ম পালনের সম্বন্ধে বিহিত পথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে পাদচারণা করেন না এবম্বিধ সাধু পুরুষ সংসারে বিরল। কোন ব্যক্তির ভ্রমের মাত্রা বেশী, কাহারও বা কম। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় ভ্রমবশে কিম্বা অন্যের কৃতকার্য্যের ফলে যেরূপে হউক, দেহের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ হইলে দেহ যদ্রূপ দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ আহার, নির্হার ও বিহার ইত্যাদি ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে মিথ্যা বা অবিহিত আচরণ করিলে উহার দরুণ দাহ এবং কুফল ভোগ না করিয়া দেহের পরিত্রাণ নাই। মিথ্যা আহার ও বিহারাদি দ্বারা দেহস্থ দোষ সামান্যভাবে প্রকুপ্ত হইলে প্রকৃতিদত্ত ভেষজ জঠরাগ্নিই উহার সংশোধন করিয়া থাকে; কিন্তু দোষের প্রকোপ জঠরাগ্নি অপেক্ষা গুরুতর হইলে সহজে সংশোধন হইতে পারে না। তখন শুদ্ধি বা সংশোধন জন্য অন্য প্রকারের সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। দোষ প্রকুপ্ত হইয়া কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে আবরণ করিতে আরম্ভ করিলে কোষ্ঠাগ্নির তেজ ক্রমে মান্দ্যদশা প্রাপ্ত হওয়ায় পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে এবং ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। যখন দোষ বিশেষ প্রকুপ্ত হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে এককালেই আবরণ করে, পরিপাক ক্রিয়া আর হয় না, তখন জ্বর উপস্থিত হয় বা উহাকে জ্বররোগ কহে। জ্বর অন্য সর্ব্ব রোগাপেক্ষা প্রধান ও বলবান্। উহা জন্মিলে দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ তাপযুক্ত

হয়। দোষ কর্ত্তৃক অগ্নির অবরোধ বা জ্বর না জন্মিলে দোষজ অন্য কোন রোগ জন্মে না। অতএব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বর ব্যাধি রোগাগ্রজ অর্থাৎ সকল রোগের দাদা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জ্বর সর্ব্ব রোগাপেক্ষা প্রধান ও বলবান্। উহা জন্মিলে দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ তাপযুক্ত হয়। ব্যাধির রূপ কল্পনা করিলে অন্যান্য ব্যাধির প্রকৃতি এইরূপ অনুভূত হয় যে, তাহারা মনে করে, আমরা রোগীর শরীরে অঙ্কুরিত হইলাম, রোগী কুপথ্য করুক, শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া আমরা দুই দিন ভোগ ও সুখে অবস্থিতি করি। কিন্তু জ্বর জন্মমাত্রই ইচ্ছা করেন যে, রোগী কুপথ্য করুক, আমি অবিলম্বেই উহাকে সংহার করি। অন্যান্য রোগ ক্লেশদায়ক আর জ্বর সংহারক। যে দেহ জ্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না তাহাকে নিজ্জ্বর কহে। নিজ্জ্বরত্বই নির্জ্জর অবস্থা বা দেবদেহপ্রাপ্তির পরোক্ষভাবে কারণ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষের মধ্যে কখন একটী, কখন দুইটী, কখন বা তিনটী দোষই প্রকুপ্ত হইয়া জ্বর উপস্থিত করে। দোষপ্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জ্বরেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় যে প্রণালীর অত্যাচার করা যায়, সেই প্রণালীর নূতন ব্যাধি দেহে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে শাখা ও পল্লব বিস্তার করিয়া থাকে। ব্যাধি সকল এক, দুই বা ত্রিদোষজ অথবা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক (ত্রিদোষজ)। একদোষজ ব্যাধি অপেক্ষাকৃত সহজ, দ্বিদোষজ মধ্যম ভাবের এবং ত্রিদোষজ ব্যাধি অত্যন্ত কঠিন। বায়ুদুষ্টিতে জৃম্ভণ, পিত্তদুষ্টিতে নেত্রদ্বয়ের দাহ এবং কফদুষ্টিতে অন্নে অরুচি এই সামান্য লক্ষণ অনুভূত হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে ভিন্ন ভাবের বিশেষ লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাধিসকল সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য ভেদে ত্রিবিধ। যাহা পথ্য ও ঔষধাদির সাহায্যে উন্মূলিত হইতে পারে তাহাকে সাধ্য, যাহা পথ্য ও ঔষধের সাহায্যে

দমিত থাকে, কিন্তু কোন প্রকার অত্যাচার হইলেই বৃদ্ধি বা প্রকাশ পায় তাহাকে যাপ্য এবং যাহার পথ্য ও ঔষধাদির সাহায্যে নিবারণ অসম্ভব তাহাকে অসাধ্য ব্যাধি কহে। যথাসময়ে চেষ্টা না হইলে সাধ্য ব্যাধি যাপ্যে এবং যাপ্য অসাধ্যে পরিণত হইয়া থাকে। এজন্য রোগের প্রথম অবস্থাতেই বিহিত পথ্য ও ঔষধাদি প্রয়োগ আবশ্যক।

ত্রিদোষের মধ্যে যে কোনটী প্রকুপ্ত হউক না কেন, জঠরাগ্নি সর্ব্বদাই উহাকে সাম্য করিতে চেষ্টা করে। জঠরাগ্নির শক্তি অপেক্ষা দোষের প্রকোপ অধিক হইলেই ঔষধের সাহায্য প্রয়োজন হয়। জঠরাগ্নি প্রকৃতি-প্রদত্ত ঔষধ, কিন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ মিথ্যা আহার বা বিহারাদি জনিত। জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে দেহের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। তখন বক্তব্যও কিছু থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ আছে, সামান্য পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিশেষ কঠিন পদার্থকেও অনায়াসে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। দোষপ্রকোপের কারণ মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্দ হইলে উহা বৃদ্ধির কারণ থাকে না, সুতরাং জঠরাগ্নি সহ যুদ্ধের যত্ন নিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেরূপ কোন অঙ্কুরসৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, উহার মূল শুষ্ক হইলে অঙ্কুরটী অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ রোগোৎপত্তির প্রথমেই উহার মূল বা নিদানস্বরূপ মিথ্যা আহার ও বিহারাদি পরিবর্জ্জন করিতে সক্ষম হইলে উৎপন্ন ব্যাধিটী অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় পথ্যাপথ্যের প্রতি বিবেচনা করিয়া চলিতে সক্ষম হইলে রোগনিবৃত্তি হয়। কিন্তু পথ্যাপথ্যবিচারহীন ব্যক্তির শত ঔষধ সেবনেও কোন ফল হয় না। ঘোর বলীয়সী তৃষ্ণা সদ্য প্রাণ বিনাশ করে, তদ্ধেতু তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণধারণের হেতু স্বরূপ পানীয় প্রদান করা উচিত। অপিচ তৃষিত ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হেতু প্রাণ পরিত্যাগ করে, অতএব রোগীর যে কোন অবস্থা হউক, বারিপ্রদান বন্দ

করা উচিত নহে। কেবল অল্প মাত্রায় কিছু কিছু কালের ব্যবধান দেওয়া উচিত।

মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্দ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবম্বিধ সাধুপুরুষ সংসারে বিরল। মনুষ্য সর্ব্বদা বিপথে ভ্রমণ করিয়া নানা-প্রকারে দোষবৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করিতেছে। জীবের নানা অবিহিত আচরণ হেতু দোষ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বদাই জঠরাগ্নিকে আবরণ ও নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। অতএব মধ্যে মধ্যে মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্দ করিয়া সুসংযত ভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলে দোষের প্রকোপ সংশোধিত হইয়া যায়। ভ্রমপথে চলিলেও আবার কিছুকাল স্বচ্ছন্দ শরীরে অবস্থিতির কারণ জন্মে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ উক্ত প্রকার সংযমের পক্ষে একাদশী তিথিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অন্য তিথিতে উপবাসের কোন ফল হয় না এরূপ নহে। অনেকে রবি বা সোমবারে উপবাস করিয়াও বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিশিপালন করিলেও দেহের উপকার প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সহিত চন্দ্রকলার সম্বন্ধের ন্যায় দেহের জোয়ার ভাঁটার সহিতও উহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অতএব তিথিবিশেষে কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা। শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় উপবাস করিলেই উপকার হয়। আর সেই উপবাস একাদশী তিথিতে করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বহুশাস্ত্রদর্শী এবং অদ্ভুতপ্রতিভাশালী মহর্ষিগণ বিশেষ গবেষণার পর একবাক্যে সংযম ও উপবাসের পক্ষে একাদশী তিথিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নানা কুতর্কের অধীন হইয়া হঠকারিতা-প্রদর্শন অপেক্ষা বরং তাঁহাদের অনুশাসন পালনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল-জনক। স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে।

যেমন অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে উহা দগ্ধ হয়, এই স্মৃতি অগ্রাহ্য করিলে সমুচিত প্রতিফল অবিলম্বেই প্রাপ্ত হইতে হয়। তদ্রূপ সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিদিগের বিধি ও নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেই দগ্ধ হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোক্ত একাদশীর উপবাস দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পরম পবিত্র ব্রত।

উপবাসের দিন আহারের সময় উপস্থিত হইলে চিত্তের বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কিছুকাল সহ্য করিলেই দোষ-সংশোধনের সূত্রপাত হয়। সংযমের নির্দ্ধারিত কাল অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইলে দেহের দোষ অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া যায়। শাস্ত্র-কর্ত্তারা একাদশী প্রভৃতি সংযম ও উপবাসের দিনে অশক্তের সম্বন্ধে যথাশক্তি আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অশক্ত লক্ষণ দ্বারা তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুতর্কের দ্বারা লোভী ব্যক্তি আপনাকে অশক্ত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রকর্ত্তারা আট বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু, অশীতির ঊর্দ্ধবয়স্ক বৃদ্ধ, গর্ভিণী এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস, ক্ষয়, শোষ, যক্ষ্মা, ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের কাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অশক্ত সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশক্ত ব্যক্তির পক্ষেও সংযম ও উপবাসের দিনে সহ্য অনুসারে আহারের সময় হইতে এক বা দুই যাম অথবা অবস্থাবিশেষে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইলে মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। একাদশীর মধ্যে শয়ন, উত্থান এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন এই তিনটীই সর্ব্ব-প্রধান। উক্ত দিবসত্রয়ে সহ্য হইলে নিরম্বু উপবাসই নিতান্ত আবশ্যক। উপবাসের পর পারণের পূর্ব্বে মলমূত্রাদির বেগধারণ বিশেষ দূষণীয়। পারণের সময় প্রথমে অতি সামান্য আহার্য্য লইয়া অতিশয় ধীরতা ও সতর্কতার সহিত উদরস্থ করিতে হয়। প্রথমে অধিক দ্রব্য উদরস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ গলদেশে ক্ষত বা শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু

পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। সংযতচিত্তে কার্য্য করিতে হইবে, ইহা মনে রাখিলে কোন বিপদ্ প্রায়শঃ উপস্থিত হয় না।

যেরূপ কোন ক্ষুদ্র অগ্নি লঘু ও অল্প পরিমাণ কাষ্ঠের সাহায্যে প্রবল হইলে উহা দ্বারা খাণ্ডব দাহন পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, এবং প্রবল হওয়ার পূর্ব্বে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ সমর্পণ করিলে হঠাৎ নির্ব্বাণের আশঙ্কা জন্মে, তদ্রূপ দোষের ক্ষয় হইয়া কোষ্ঠাগ্নি প্রবল ভাব ধারণের পূর্ব্বেই যদি লঘু আহারের পরিবর্ত্তে গুরুতর আহার করা যায়, তাহাতে অগ্নি প্রবল হওয়ার পরিবর্ত্তে পুনরায় তিরোহিত হইবার আশঙ্কা জন্মে; এজন্য উপবাসের পর পারণের সময় প্রথমে অল্পপরিমাণে লঘু ও বিশুদ্ধ ভাবের আহার্য্য গ্রহণ করাই বিধেয়। সংসারে এরূপ লোক অনেক আছেন, যে ব্যক্তির আহার্য্যসংগ্রহে দৈনিক চারি আনা ব্যয় হইয়া থাকে, উপবাসের পর পারণের সময় তিনি এক সন্ধ্যার জন্য আট, দশ আনা ব্যয় না করিয়া ক্ষান্ত হন না। ঈদৃশ ব্যবহার বিশেষ দূষণীয় ও ন্যায়বিগর্হিত। একাদশীব্রত আহার ও বিহার সম্বন্ধে সংযমের এবং নির্হার সম্বন্ধে বিশেষ নিরালম্বের দিন। লোভ ও কুযুক্তির বশে উহার ফল নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। যিনি মনের অকাপট্যে শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত সংযত ভাবে একাদশীব্রত পালন করিতে সক্ষম হন, তাঁহার শরীর ক্রমেই ব্যাধিমুক্ত হইতে থাকে এবং জীবনকাল স্ফূর্ত্তির সহিত কাটিয়া যায়। একাদশীব্রত নির্জ্জর বা দেব-দেহ লাভ করিবার প্রথম সোপান স্বরূপ।

দূষ্য পদার্থ আহারে দোষের প্রকোপ হয়, আবার পুষ্টিকর পদার্থ অবিহিত পরিমাণে গ্রহণ করিলেও দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। অতএব পরিমিত আহার সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনুষ্যের মিতাহারী হইবার নানা উপায় আছে। তন্মধ্যে যে কিছু আহার্য্য এক-যোগে গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেব উদ্দেশে নিবেদন করিব এবং একযোগে

গৃহীত ও নিবেদিত সেই অন্ন ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিব না, অপিচ উচ্ছিষ্টও রাখিব না। ঈদৃশ সংকল্প, মিতাহারী হইবার একটী প্রধান উপায়। উল্লিখিত সংকল্প সাধনের চেষ্টায় মনকে দৃঢ় করিতে সক্ষম হইলে আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণের সময় মনুষ্য পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে। এইরূপে কিছুকাল স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে অনুষ্ঠান করিলেই মিতাহার আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। মিতাহার স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান উপায়। অতঃপর নির্হার ধর্ম্মের বর্ণনা করা যাইতেছে।

মলের সংযোগ ও অত্যাচার হইতে দেহকে মুক্ত করিবার জন্য যে যত্ন ও ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নির্হারধর্ম্মপালন কহে। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে নির্হারধর্ম্মপালন দুই ভাগে বিভক্ত। বাহ্য মল-শুদ্ধি পক্ষে গঙ্গা বা সলিলই সর্ব্বপ্রধান সহায়। মলাপসারণপূর্ব্বক পবিত্র হইবার প্রধান সহায় বলিয়াই বোধ করি, গঙ্গা মাতা শব্দে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। যোগশিক্ষা ব্যতীত আভ্যন্তরিক মলশুদ্ধির প্রণালী শিক্ষা হয় না। যোগসাধন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত উহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। বর্ত্তমানকালে বিশেষ শুভাদৃষ্ট ব্যতীত সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে না। গৈরিকধারী যোগাভ্যাসরত যে দুই চারিটী ব্যক্তিকে সমাজমধ্যে বিচরণ করিতে দেখা যায়, গুরুর কৃপায় হয়ত তাঁহারা দুই চারিটী ক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছেন; সকল বিষয়ের আগম ও নিগম উৎকৃষ্টরূপে অবগত নহেন। অথচ সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি আপনাকে একজন মহাযোগী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তোমাকে একটী ক্রিয়া শিক্ষা দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত করিলেন; আশার কুহকে বৎসরের পর বৎসর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়াও তোমার আর কোন ক্রিয়াশিক্ষার সুবিধা হইল না। দেশে এবম্বিধ যোগীর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, প্রকৃত মহাযোগীর অস্তিত্ব ভারত হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বোধ করি, তাঁহারা

লোক-কোলাহল হইতে দূরে নিবিড় জঙ্গল বা পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে জনস্থানে প্রবেশ করিলেও আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে ইঁহারা বড়ই বিমুখ। বিশেষ শুভাদৃষ্ট ব্যতীত এই সমস্ত মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটিয়া উঠে না। জনশ্রুতি আছে যে, প্রকৃত আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিলে ভগবান্ তাহার সদ্গুরু মিলাইয়া দেন। সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত যোগমার্গে প্রয়াণ বিশেষ আশঙ্কাজনক; কোন যোগসঙ্কট উপস্থিত হইলে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়া যোগ-সংক্রান্ত কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই অনুচিত। যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একজন পল্লবগ্রাহী মাত্র, সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শৈশবে প্রতিপালক শিবধাম কাশীতে শিবত্বপ্রাপ্ত মহাযোগী পিতৃব্য মহাশয়ের চিত্র সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত রহিয়াছে। সেই পূজনীয় সাধকচিত্রের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেই মদীয় অভীষ্ট সাধনের উপযোগী হইবে। অতএব সেই অদ্ভুত চিত্র দর্শন ও অন্যান্য প্রকারে যোগতত্ত্বানুসন্ধানের ফল নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

হিন্দুর যোগ-শিক্ষা যাঁহারা আবশ্যকীয় মনে করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে ষট্চক্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। যাঁহাদের হিন্দুর শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের নিম্নলিখিত অংশ ইচ্ছা হইলে পাঠ না করিলেও পারেন। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র-পাঠককে এবম্বিধ অনুরোধ আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও করি নাই। সে যাহা হউক;——

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

"কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন, যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মস্জিদে গির্জ্জে কি মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রশ্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে যাগে যোগিমঠে,
সরলে কি শঠে হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাঁথারে প্রান্তরে॥
লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মায় বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্মাণ্ডে কি অণ্ডবাহিরে॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেড়ো নদিয়া মেদিনে,
রিভার জর্ডানে গার্ডেন অব ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে॥
ভারত অশক্ত সে ভার ধারণে, সাংখ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিলটনে কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।
(তিনি)কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যিশু,কালী কি কানাই বসু শিশুবাসু,
কোন্‌নামে কোন্‌ডাকে সাড়া দেন কাকে,স্বরূপ বলিতে সেই পারে॥
ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্রশীর্ষে সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার বর্ণে সাধ্য কার, ওকারে আছেন কি ওঁকারে।
কে বলিতে পারে পরে কোন্ বাস, (তাঁর) কোঁচা পেন্টুলনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যালে কি বাখালে গুধুড়ি কম্বলে, কৌপীনে কি বাঘাম্বরে॥
ব্র্যাণ্ডি কি জিনে, সেরি স্যাম্পিনে, রুটি বিস্কুটে পলাণ্ডু লশুনে,
মালপো মালসাভোগে ম’ষে মেষে ছাগে, পাকাপাতা বাত আহারে।
বেণু বীণা বোলে থমকে কি খোলে, তোপে কি ডাউসে জয়ঢাকে ঢোলে,
নেড়ানেড়ীদলে বাউলের পালে, শিঙ্গা কাড়া কাঁসী কাঁসরে।
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী-সম্ভোগে, নরকনিকরে শূকরী-সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে সমভাবে পাই ভেবে যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে আছেন কি রত্নের আকরে।
প্যারি বলে এমন কে আছে সংসারে, (যে) নিগূঢ় তাঁর নির্ণয় করে॥”

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

পাঠকবৃন্দ! তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তন্ময় কবির অন্তরের ধারণা শ্রবণ করিলেন। পরন্তু যোগশাস্ত্রপ্রণেতাগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের যে বিশেষ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন।

যোগতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, সাধনা দ্বারা যোগমার্গে অগ্রসর না হইলে মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হয় না। সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে যোগের ক্রিয়াগুলি সত্য বা প্রলাপ, উহাতে বিশেষ কোন স্বার্থ আছে বা নাই, ধারণা হইতে পারে না। সুতরাং আদিতে শাস্ত্রে বিশ্বাসই যোগী হইবার প্রধান উপায়। যোগশিক্ষার প্রথম অবস্থায় ষট্‌চক্রের সঙ্গে সঙ্গে যোগ সম্বন্ধীয় কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, উহাতে বিশ্বাস স্থাপন ও সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণে নানা যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাযথরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতীত কেবল বাহ্য বাগাড়ম্বরে যোগ শিক্ষা হয় না। যাঁহারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই যোগের অলৌকিক শক্তি এবং তৎকর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক উন্নতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যোগের নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। যথা ;—কোন বিশেষ বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হইলে তাহাকে যোগ বলা যায়। অনেকে কর্ম্ম সাধনের কৌশলকে যোগ বলেন। সাধকগণ যে ক্রিয়া দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়াছেন। দার্শনিকগণ চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত যোগের আরও নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ফলতঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারাই জীবাত্মার পরমাত্মা সহ সংযোগ হইয়া থাকে। অতএব যোগের শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুইটীকে যোগতত্ত্বজ্ঞ অনেকেই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যোগীদিগের মতানুসারে আমাদের এই দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। বিস্তৃত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অতি সূক্ষ্মভাবে দেহ-ভাণ্ডে বর্ত্তমান আছে। এজন্য তাঁহাদিগের মতে তীর্থভ্রমণ বিশেষ

আবশ্যকীয় নহে। যোগিগণ কেবল সাধু ও মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎ লাভের আশায় তীর্থভ্রমণ করিয়া থাকেন। ষট্‌চক্রকার গুহ্যদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতটী পদ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে গুহ্য ও লিঙ্গের ঠিক মধ্যভাগে চতুর্দ্দল মুলাধার পদ্ম অবস্থিত আছে। মূলাধার পদ্মে জীবাত্মা এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রভৃতি বাস করিতেছেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মদ্বারের মুখ আবৃত করিয়া সর্পবৎ সার্দ্ধত্রয় বেষ্টনে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গের শিরোপরি শয়ন করিয়া আছেন। লিঙ্গ-মূলে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান পদ্ম; নাভিমূলে দশদল মণিপুর পদ্ম; হৃৎ-প্রদেশে দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত পদ্ম; কণ্ঠদেশে ষোড়শদলসমন্বিত বিশুদ্ধসংজ্ঞক পদ্ম; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞানামক দ্বিদল পদ্ম। আজ্ঞাচক্রের উপরিভাগে শিরোদেশে যে শূন্যাকার স্থান আছে, তাহার নিম্নে প্রকাশমান সহস্রার পদ্ম বিরাজিত আছে। উল্লিখিত পদ্মসমূহে নানা প্রকার শক্তি ও দেব-দেবীর অধিষ্ঠান আছে। প্রত্যেকটী এক একটী কেন্দ্র বা (centre) স্বরূপ অথবা প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত এক একটী অভেদ্য দুর্গবিশেষ। সহস্রার পদ্মের উপরে উপরোক্ত শূন্যাকার স্থানে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। শাক্ত ও শৈবের মতে উহা পরম শিবের স্থান, বৈষ্ণবের মতে উহা মহাবিষ্ণুর স্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের মতে উহা পরমব্রহ্মের স্থান ইত্যাদি। জীবাত্মা পত্নী এবং পরমাত্মা পতিস্বরূপ। যোগশাস্ত্রোক্ত এই সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস না জন্মিলে হিন্দুর যোগ শিক্ষা করা যায় না। যোগশাস্ত্রানু-শীলন এবং গুরু উপদেশক্রমে যৌগিক নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমতঃ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদ্বার ছাড়িয়া দিলে, জীবাত্মা সহ কুলকুণ্ডলিনীকে উক্ত দ্বারে প্রবেশ করাইতে হয়। পরে যৌগিক নানা ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা উপরিস্থ অভেদ্য দুর্গস্বরূপ ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মস্থান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত

শূন্যস্থানস্থিত নিজ পতি পরমাত্মা পরমশিবের সহিত সঙ্গম করাইতে হয়। ইহা হইতে পূর্ণানন্দ পরম্পরা ভোগ করিতে করিতে ব্রাহ্মীমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাকেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাধারণ সংযোগ বলে। বিশেষ সংযোগের কথা পরে বলা যাইতেছে। সাধারণ সংযোগে পতি ও পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু বিশেষ সংযোগে যুগল এক হইয়া যায়।

একমাত্র চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তি কত প্রকার? চিত্তবৃত্তি অসংখ্য হইলেও শাস্ত্রকর্ত্তারা উহাকে প্রধান পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যাহার মন সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নাম চিত্তবৃত্তির ক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়াছেন। যাহার মন পাষাণের ন্যায় কঠিন, কিছুই প্রবেশ করে না, ভ্রমেও সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় না, কেবল রাজসিক ও তামসিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিরাজিত থাকে, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নাম চিত্তবৃত্তির মূঢ় অবস্থা বলিয়াছেন। যাহার মন ক্ষিপ্তাবস্থায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে স্থির ভাব ধারণ করে, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নাম চিত্তবৃত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়াছেন। মন যখন কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ স্থির বা একতান ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, অথবা রজস্তমঃ বৃত্তি অভিভূত হইয়া কেবল সুখময় ও প্রকাশময় সাত্ত্বিক বৃত্তি উদিত থাকে, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহাকে মনের একাগ্র বৃত্তি বলিয়াছেন। চিত্তের একাগ্র বা একতান বৃত্তিকালে কোন অবলম্বন থাকে, নিরুদ্ধবৃত্তিকালে তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিতে লীন হইয়া দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। নিরবলম্ব দগ্ধসূত্রের ন্যায় সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিত একাগ্রবৃত্তিকে

শাস্ত্রকর্ত্তারা চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা বলিয়াছেন। চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধ বৃত্তিই যোগের প্রধান সহায়। ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা বিক্ষিপ্ত বৃত্তির দ্বারা যোগের কোন কার্য্য হয় না। চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধাবস্থা ব্যতীত আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত থাকায় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হয় না; সুতরাং যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিতে হয়। চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মা সহ সংযোগ করিতে হইলে শাস্ত্রাধ্যয়ন-পূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটী যোগাঙ্গের মর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত এবং সদগুরুর উপদেশ লইয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যোগশাস্ত্রের উক্তি কেবল কল্পনাবিজড়িত প্রলাপ নহে। অপিচ যাহাদের অনধিকার-চর্চ্চা, তাহাদের নিকট সমস্তই অন্ধকার স্বরূপ।

আমরা শ্বাস ও প্রশ্বাসদ্বারা যে বায়ু গ্রহণ ও বিরেচন করি, উহাই আমাদের জীবন ধারণের উপায় বা প্রাণস্বরূপ। দেহস্থ বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ হইলেও শাস্ত্রকর্ত্তারা অবস্থান ও ক্রিয়াভেদে উহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। যথা;—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রকার বায়ুর মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটীই প্রধান; উহার মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান বায়ুই প্রধানতম। প্রাণবায়ু হৃদয়ে অবস্থান করে। আহার্য্য পদার্থের সারাংশ রস, রক্তে পরিণত হইবামাত্র উহা আবশ্যকীয় স্থানে প্রেরণ করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। অপান বায়ু গুহ্যদেশে অবস্থিতি করিতেছে। কোন দ্রব্য উদরস্থ হইবামাত্র গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত করিবার জন্য উহা ভীমবেগে আকর্ষণ করে। মধ্যপথে যে অংশ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা রসরূপে পরিণত হয়, তদ্বাদে মলস্বরূপ অবশিষ্টাংশ আকর্ষণ করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত করে। গুহ্যদ্বারই মলোৎসর্গের

সর্ব্বপ্রধান দ্বার। সমান বায়ু নাভিমণ্ডলে পাকস্থলীতে অবস্থান করিয়া পিত্তরস ও শ্লেষ্মার সহিত যোগে ভুক্তান্ন পরিপাকের সহায়তা করে। উদান বায়ু কণ্ঠে অবস্থিতি করিয়া উদরস্থ পদার্থ উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে। ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছে। এই বায়ুর প্রভাবে ইচ্ছামত দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারা যায়। নাগ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে নাগের কর্ম্ম উদ্গীরণ, কূর্ম্মের উন্মীলন অর্থাৎ (সঙ্কোচ ও প্রসারণ), কৃকরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেবদত্তের জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয়ের কর্ম্ম হিক্কা। বায়ুসমূহের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে অপান বায়ুর শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন কারণে অপান বায়ুর শক্তি হ্রাস হইলে আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ হইলেও যথাসময়ে যথাস্থানে নীত হয় না; সুতরাং পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রযুক্ত যথোচিতরূপে রস-রক্তাদি জন্মিয়া দেহের পোষণ হয় না। অপানের ক্রিয়া বন্ধ হইলে প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হয়। এই জন্য অপানই দেহমধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ুরূপে পরিগণিত। বৈদ্যক গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্যাধিবিশেষে অপানের শক্তি লোপ হইয়া মলদ্বার অনাবৃত অর্থাৎ রোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া যখন তখন মল নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে সেই রোগীর আর চিকিৎসা করিবে না। যেহেতু অপানের শক্তিলোপ রোগের অসাধ্য লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে প্রণালীতে শ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ, ধারণ এবং ত্যাগ চলিতেছে, উহা পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশমতে গ্রহণ, ধারণ এবং ত্যাগ করিলে তাহাকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত। যথা;—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বায়ুগ্রহণের নাম পূরক, ধারণের নাম কুম্ভক এবং ত্যাগের নাম রেচক। প্রাণায়াম বিশেষতঃ কুম্ভক নানা প্রকার। শাস্ত্রোক্ত সহজ প্রাণায়ামের নিয়ম এই যে, পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রুদ্ধ করত কোন বীজের

চারিবার উচ্চারণকাল পর্যান্ত ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূরক করিতে হয়। পরে মধ্যমা এবং অনামিকার দ্বারা বাম নাসিকাও রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীজের ষোড়শবার উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত কুম্ভক করিতে হয়। পরে অঙ্গুষ্ঠের আবরণ মোচন করিয়া বীজের আট বার উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিতে হয়। আবার পিঙ্গলা দ্বারা পূরক করিয়া উপরোক্ত নিয়মে বিপর্য্যস্ত ভাবে ইড়া দ্বারা রেচন করিতে হয়। ইহা-কেই প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্থ হইলে পূরক, কুম্ভক ও রেচক কার্য্যে বীজ উচ্চারণের কাল দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ ইত্যাদিরূপে বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রাণায়াম দ্বারা অপান বায়ুর গতি হয় এবং উহার স্থিরতা জন্মে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে অপানের শক্তি এত-দূর বৃদ্ধি পায় যে, দেহের আভ্যন্তরিক মল আকৃষ্ট হইয়া অনায়াসেই বহির্গত হইয়া যায়। যাহার প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সহজ যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা অপান বায়ুর শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ুর কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে চলিতে আরম্ভ হয়। প্রাণবায়ুর কার্য্য বিনা বিঘ্ন-বাধায় চলিলে চিত্তের স্থিরতা জন্মে এবং নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহাদের দেহে মেদ ও শ্লেষ্মার আধিক্য আছে, তাঁহাদের কেবল প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। তাহাদের ঘট অর্থাৎ দেহ শোধন জন্য সম্যক্‌রূপে ষট্‌কর্ম্মানুষ্ঠান আব-শ্যক করে। শাস্ত্রকর্ত্তারা ঘট শোধনের জন্য ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক এবং কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম্মের শিক্ষা প্রচার করি-য়াছেন। ষট্‌কর্ম্ম অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে, বাত, পিত্ত ও কফজ নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়; রস-রক্তাদি ধাতু, ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃ-করণ সমস্তই প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। দেহের কান্তি এবং জঠরাগ্নিও বৃদ্ধি

পাইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর অধীন হইয়া যোগের নানা প্রকার ক্রিয়া,—মুদ্রা, আসন প্রভৃতি অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে সর্ব্ব ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নির্জ্জর অবস্থা বা দেবদেহ লাভ করা যায়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া যোগানুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব ষট্‌কর্ম্মের নানা অঙ্গ বর্ণনা না করিয়া যোগশিক্ষার্থী, প্রথমে কি প্রকারে যোগমার্গে প্রবেশ করে, তাহাই বুঝাইবার জন্য কেবল মূলশোধন ধৌতি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বলিতেছি। প্রথমতঃ বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির নখ উত্তমরূপে কর্ত্তন করিয়া প্রস্তর বা তদ্বৎ কোন কঠিন দ্রব্যের উপর ঘর্ষণ করিয়া লইতে হয়। যেন অণুমাত্রও ধার না থাকে। মলত্যাগের পর জলশৌচের পূর্ব্বে স্থলে হউক অথবা জলৌকা কিম্বা অন্য প্রকার উপদ্রববিহীন নাভি পর্য্যন্ত মগ্ন হইতে পারে এরূপ জলাশয়ে উৎকটাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক উল্লিখিত অঙ্গুলি মলদ্বার দ্বারা প্রবেশ করাইয়া মূলাধার পদ্মের নিম্নভাগ নাড়িয়া দিতে হয় এবং মল নিঃসরণের জন্য পুনঃপুনঃ বেগ দিতে হয়। এই ক্রিয়া দ্বারা অনেক লুক্কায়িত মল মলদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে বহিষ্কৃত এবং দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়। পদাঙ্গুলিসমূহ ভূমিতে রাখিয়া গুল্‌ফদ্বয় ঊর্দ্ধে স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করিলে, উহাকে উৎকটাসন কহে। উৎকটাসনে উপবেশনপূর্ব্বক উল্লিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে কেবল যে বিষ্ঠাই নির্গত হয় এরূপ নহে, শ্লৈষ্মিক বা অন্য প্রকারের মলও গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত মলদ্বারের পিচ্ছিল ভাব দূর না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং ধৌত করিবে। ইহাকেই মূলশোধন ধৌতি কহে। *

* গুরুবিহীন অবস্থায় কেহ যেন এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হন। যিনি

মূলশোধন ধৌতি শিক্ষা করিলে যোগশিক্ষার্থী অন্তর্ধৌত বা আভ্যন্তরিক মলশোধনের পথ দেখিতে পায় এবং তাহার যোগমার্গে ভ্রমণের সূত্রপাত হয়। ষট্‌কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিলে মলের ন্যায় দুষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মাদিও দেহ হইতে দূর করা যায়। কিন্তু অত্রস্থলে আমি উহার বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহার সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া ইচ্ছা আছে, তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া সবিশেষ অবগত হউন। মূলশোধন ধৌতি অভ্যাস করিলে অপান বায়ুর ক্রূরতা বিনষ্ট হয় এবং বহু প্রকার ব্যাধি দূরে পলায়ন করে। উল্লিখিত ক্রিয়া অভ্যাস করিলে রুগ্ন ব্যক্তি সামান্য পাতা-লতার রস প্রয়োগে যে উপকার প্রাপ্ত হয়, ক্রিয়াহীন লোকের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত মহামান্য মহৌষধেও তদ্রূপ উপকার পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। উদরাময় কিম্বা ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপান বায়ুর শক্তি হ্রাস হইবার পূর্ব্বে মূলশোধন ধৌতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যু আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং সহজেই আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

কেবল গুহ্যদ্বারই মলনিঃসারণের দ্বার নহে। নয়টী প্রধান দ্বার এবং অসংখ্য লোমকূপ দিয়াও দেহের মল নিঃসারিত হয়। প্রশ্বাস দ্বারাও বায়বীয় মল নিঃসারিত হইয়া থাকে। নির্হার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে সমস্ত প্রধান দ্বার এবং লোমকূপাদিকে, মলের সংযোগ হইতে মুক্ত করিতে হয়। দিবা বা রাত্রিমানকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিলে উহাকে যাম বা প্রহরকাল এবং উহার অর্দ্ধভাগকে যামার্দ্ধ কহে। রাত্রিশেষ যামার্দ্ধকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে উহার প্রথম ভাগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এবং শেষ ভাগকে রৌদ্র মুহূর্ত্ত কহে। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ শয্যা হইতে উত্থান এবং মলত্যাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সর্ব্বা-

বায়ুর উত্তেজনা নিবারণ করিতে অসমর্থ, তিনিও যেন মহাজন বাক্য লঙ্ঘন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অন্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইতে চেষ্টা না করেন।

পেক্ষা উৎকৃষ্ট সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কোন দোষের প্রাবল্য হেতু মল বিশেষরূপে আবদ্ধ না থাকিলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তরূপ কালের সহায়তায় পরিষ্কাররূপে নির্গত হইয়া যায়। দেহের কোন প্রকার বিকৃতি নিবন্ধন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সামান্য ভাবে নির্গত হইলেও উহা ভবিষ্যৎ সংশোধনের পথ প্রশস্ত করে। এজন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মলত্যাগ অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। প্রধান মলদ্বার গুহ্যদ্বারের শুদ্ধি সমাধা হইলে অবশিষ্ট প্রধান আটটী দ্বার, লোমকূপ, কেশকূপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বিধান এবং পর্য্যায় ক্রমে মলের সংযোগ হইতে মুক্ত এবং শুদ্ধি সাধন করিতে হয়।

মুখ দেহের একটী প্রধান দ্বার। এই দ্বার দিয়াই আহার্য্য পদার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। মুখের কোন অংশ মলযুক্ত না থাকে, এ বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। মুখের শুদ্ধি সাধন করিতে হইলে জিহ্বা, দন্ত, কণ্ঠ প্রভৃতি সমস্তই শোধন বা পরিষ্কার করিতে হয়। শাস্ত্রকর্ত্তারা কে পত্র, করবী, আম্র, করঞ্জ, বকুল ও আসন এই কয় বৃক্ষের শাখা দন্তধাবনের পক্ষে সুপ্রশস্ত বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত দুগ্ধের ন্যায় আঠা ক্ষরে বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষমাত্রের শাখাও দন্তকাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অপিচ তাল, হিন্তাল, গুবাক, খর্জ্জূর, নারিকেল, তাড়িয়াৎ ও কেতকীদল প্রভৃতির শাখা দন্তধাবনের পক্ষে এককালেই নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। দন্তকাষ্ঠ ঊর্দ্ধাধোভাবে ধাবন করাই উচিত। পরন্তু অজীর্ণ, বমন, হৃদ্‌রোগ, দন্তরোগ, নবজ্বর, অথবা যে প্রকারের কাসরোগ হউক, বর্ত্তমান থাকিলে দন্তশোধন চূর্ণ ব্যতীত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার উচিত নহে। দন্তমার্জ্জনের পক্ষে খদির একটী প্রধান উপাদেয় বস্তু; দন্তমার্জ্জন সমাধা হইলে মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক তোয় অর্থাৎ জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া চক্ষুর মল ধৌত করিতে হয়। মুখ তোয় দ্বারা পূর্ণ না হইলে চক্ষুর মল ধৌত হইলেও দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে না। জিহ্বা

নির্লেখনের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা আয়স (লৌহ) নির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলাই উৎকৃষ্ট। অন্য ধাতুনির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলা ব্যবহার বিধেয় নহে। যোগিগণ কেবল আয়স নির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাই যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কণ্ঠ সংশোধনের জন্য তর্জ্জনী, মধ্যমা, এবং অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলির সাহায্যে জিহ্বা ও কণ্ঠমূল মার্জ্জনা করিতে হয়। উহা দ্বারা কণ্ঠের শ্লেষ্মা দোষ নিবারিত হয়। এই গুলি সমাধার পর জলে অবগাহনপূর্ব্বক দেহের সর্ব্বস্থান সলিলের সাহায্যে ধৌত ও পরিষ্কার করিতে হয়। পূর্ব্বকালে গুরুতর নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে ত্রিসন্ধ্যায়ই জলে অবগাহনপূর্ব্বক দেহের শুদ্ধি সম্পাদন করিতেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে প্রাতে ও সায়ংকালে যথাসম্ভব শুদ্ধির চেষ্টা করিয়া কেবল মধ্যাহ্নকালেই অবগাহনপূর্ব্বক দেহশুদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করিত। যোগীর পক্ষে প্রাতঃস্নান প্রশস্ত নহে। নবজ্বরে স্নান নিষিদ্ধ। দেহের মল এবং সাধারণ তাপ দূর করাই স্নানের উদ্দেশ্য। গাত্রমার্জ্জনী দূর জলে নিক্ষেপ করিয়া, উহা মগ্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বেগে জলে প্রবেশপূর্ব্বক দুই চারিটী ডুব দিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্থান, স্নান সম্বন্ধে বিশেষ দূষণীয় নীতি। নাভি পর্য্যন্ত মগ্ন হয় এরূপ জলেই স্নান করা সুবিধাজনক। স্নানান্তে কেশমল দূরীকরণ জন্য কঙ্কতি ব্যবহার আবশ্যক। কঙ্কতি কান্তি-জননী এবং কেশকীট উকুন দূর করে। পরন্তু উহা কণ্ডুঘ্ন ও মূর্দ্ধরোগজিৎ। শয়ন, আহার, উপবেশন প্রভৃতি বিবিধ নিত্য বা নৈমিত্তিক কার্য্যে দেহে অকারণে বাহ্য মলের সংশ্রব না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। পুস্তকের পত্র সঞ্চালন জন্য অঙ্গুলিতে থুথু গ্রহণ বা পেন, পেন্সিল ইত্যাদি মুখে ধারণ হিন্দু-নীতির অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান হইতে রাত্রিকালে শয়ন পর্য্যন্ত পারম্পর্য্যরূপে আহার, নির্হার বা বিহার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে যে কার্য্য যে

প্রণালীতে নিত্যই অর্থাৎ প্রতিদিন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের আহ্নিকাচারতত্ত্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাম্য ও নৈমিত্তিক বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি অন্যান্য তত্ত্বাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। অতঃপর বিহার ধর্ম্মের বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিহারধর্ম্ম বর্ণনায় প্রচলিত রুচিবিগর্হিত দুই একটী বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে। তন্নিবন্ধন বুদ্ধিমান্ পাঠকের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অধ্যাত্ম ধনের মধ্যে শুক্র ধাতুই সর্ব্বপ্রধান। উহাই রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর শেষ পরিণতি। শিবসংহিতায় উক্ত আছে যে "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥" বিন্দু অর্থাৎ শুক্র পাতেই জীবের মরণ এবং উহার ধারণেই জীবন। এতদ্ধেতু অতি যত্নের সহিত বিন্দু ধারণ করিবে। শিবসংহিতার এই মহাবাক্যই শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি উপাসকগণ শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। শুক্রধাতু পারদের ন্যায় চঞ্চলপ্রকৃতি বিশিষ্ট; সহজেই নির্গত হইয়া যায়। স্ত্রী-সংসর্গের দ্বারা শুক্রক্ষয় না করিলেই যে বীর্য্যের ধারণ হয় এরূপ নহে। মূত্রাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সময়ে উহা নির্গত হইয়া যাইতেছে। অতএব শুক্র বা বিন্দুধারণ ব্যাপারটি বড় সহজ নহে। বিন্দুধারণ-সাধনা সম্বন্ধে সকাম ও নিষ্কামগণের প্রণালীগত পার্থক্য আছে। সকামের প্রণালী রসাল আর নিষ্কামের প্রণালী শুষ্কভাবযুক্ত। হিন্দুসাধনার মধ্যে বিন্দুধারণ বিষয়টী বিশেষ গুহ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ সকল গুহ্য বিষয়ের উপদেশ বর্ণিত আছে। অপিচ বাজীকরণ-বিষয়ক নানা উপদেশ এবং ঔষধাদির তালিকাও আছে। ঘটশুদ্ধির জন্য যৌগিক ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে প্রোক্ত উপদেশ পালন ও ঔষধাদি ব্যবহার করিলে শুক্র বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ গুহ্য বিষয়গুলি সাঙ্কেতিক ভাষায়

লিখিত আছে। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত, কেবল ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে উহার ভাব পরিগ্রহ করা যায় না। সদ্‌গুরুর কৃপাই সবিশেষ অবগত হইবার একমাত্র উপায়।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর শাক্তধর্ম্মের চর্চ্চা বিশেষরূপে রুদ্ধ হইয়াছিল। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল ব্যতীত পরবর্ত্তী কালে উল্লেখযোগ্য শাক্তধর্ম্মের বিশেষ কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। পূর্ব্বের রচিত যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও প্রায়ই সংস্কৃতে লিখিত। কিন্তু বৈষ্ণব উপাসক-দিগের সাহায্য জন্য মহাপ্রভুর জন্মের পর নানা গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অনেক গ্রন্থ আবার বঙ্গভাষায় রচিত। বৈষ্ণব মহাজন-গণও শৃঙ্গাররস-বিষয়ক গুহ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিতে সাঙ্কেতিক ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত উহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন।

মনুষ্যের শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রথম সঞ্চার-কালে পশু পক্ষী ইত্যাদির সম্ভোগ দর্শন, অপিচ কামতত্ত্বের নানা আলোচনা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কামবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কাম-বীজ অঙ্কুরিত হইলেই কামিনী-সম্ভোগের স্পৃহা ক্রমেই প্রবল হইতে আরম্ভ করে। শৃঙ্গার রসের সমস্ত কথাই মনুষ্যের নিকট স্বতঃসিদ্ধ গুহ্য; মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় প্রকাশ্যে উহার কোন অনুষ্ঠান করিতে পারে না। গতিকেই কামিনী-সম্ভোগের অভিলাষ জন্মিলেও অভিলষিত পদার্থ সহ সংযোগ সকলের ভাগ্যে সহজে ঘটিয়া উঠে না। কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে সকলের সংযত ভাবে বিহিত পথে বিচরণ সাধ্য হয় না। সুতরাং নানা আপদ্ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত আপদ্ হইতে রক্ষার জন্য এতদ্দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব-দিগের যে নীতি এবং শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ইংরেজ-রাজত্বে উহা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যথেচ্ছাচারের স্রোত প্রবলবেগে

বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং দেশমধ্যে সৃষ্টিপ্রবাহ নানা প্রকারেই দোষযুক্ত হইতেছে। সৃষ্টিপ্রবাহে বিশুদ্ধিরক্ষার মূলীভূত কামতত্ত্ব পর্য্যালোচনার পথ বিলুপ্তপ্রায়, অতএব নানা আপদ্ উপস্থিত না হইবে কেন? পিতৃপুরুষগণ উল্লিখিত তত্ত্বানুসন্ধানে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা তন্ত্রাদি শাস্ত্র ও করচাগ্রন্থ প্রভৃতি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। উহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমরা সহজে সাফল্য লাভের আশা করিতে পারি। সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার আশায় নিম্নে কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে চিন্তা, অনাহার এবং অযোনিসঙ্গমই শুক্রধাতুর ক্ষয় বা বিকৃতির প্রধান কারণ। পরন্তু শুক্রনাশক পদার্থ আহার করিলেও শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে। চিন্তা দ্বারা শুক্রক্ষয় সম্বন্ধে বক্তব্য পরে বলিব। অনাহার বা উপবাস শুক্রক্ষয়ের একটী কারণ। উপবাস দ্বারা শুক্রক্ষয় হইলে পরিমিত বৃষ্য পদার্থ আহার করিলেই সংশোধন হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অযোনিসঙ্গমই শুক্রক্ষয় বা বিকৃতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। দূষিত বা বিকৃত যোনি কিম্বা ভিন্ন জীবের যোনি অযোনিমধ্যেই পরিগণিত। হস্তমৈথুন বা যোনি ব্যতীত অন্য কোন ছিদ্রে রেতঃপাতন অযোনিসঙ্গমের মধ্যে প্রধানতম। অযোনিসঙ্গম শুক্রধাতুর বিকৃতি এবং ক্লীবত্বপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। যোনি ব্যতীত অন্য কোন ছিদ্রে বা হস্তমৈথুন দ্বারা রেতঃপাত করিলে শুক্রমেহ রোগ উপস্থিত হইয়া ক্রমে ধ্বজভঙ্গে পরিণত হয়। স্ত্রীসম্ভোগজনিত হর্ষবোধ ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে থাকে। শতবার হস্তমৈথুন করিলেও অনেকের তৎক্ষণাৎ বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু উহা এতদূর দুষ্কার্য্য যে, একবার মাত্র হস্তমৈথুন

করিয়াও লোকে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতে পারে। একবার স্ত্রীসংসর্গ করিলে দেহের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, প্রাচীনেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে একবার হস্তমৈথুন দ্বারা উহার আট-গুণ অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। যাহারা হস্তমৈথুন কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত, তন্মধ্যে সকলের তৎক্ষণাৎ বিশেষ ক্ষতি দেখা না গেলেও দুই চারি বৎসর পরে হঠাৎ অবসন্ন এবং স্ফূর্ত্তিহীন হইতে দেখা যায়।

যাহারা হস্তমৈথুন করে না, অথচ দুষিত বা বিকৃত যোনি কিম্বা ভিন্ন জীবের যোনিতে উপগত হইতে ইতস্ততঃ করে না, তাহাদেরও শুক্রধাতু ক্ষয় বা বিকৃতির সূত্রপাত হইয়া থাকে। প্রভেদের মধ্যে এই যে হস্তমৈথুনকারীদিগের ন্যায়, তাহাদের স্ত্রীসংসর্গে হর্ষবোধশূন্যতা উপস্থিত হয় না। যোনিসঙ্গমের ভ্রমজনিত বিকার প্রমেহ এবং হস্ত-মৈথুনজনিত শুক্রমেহ এতদুভয়ের ক্রিয়া শুক্রক্ষয় হইলেও উভয় ব্যাধির প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য আছে। যৌবনের প্রথম সঞ্চারে কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে যাহারা সংযমে অসমর্থ তাহারা বিহিত বা প্রতিষেধক যে কোন পথ হউক অবলম্বন করে। কামেন্দ্রিয়-সঞ্চালনের যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহাতে প্রবৃত্ত হইলে বিহিত পথেও অনিষ্ট হয়, আর প্রতিষেধক পথে বিশেষ অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কুসঙ্গ এবং উপদেষ্টার অভাবে লোকে প্রায়শঃ বিপথে ধাবিত হয়। যৌবনসমাগমে অনেকে অবিহিত সঙ্গম দ্বারা শুক্রক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দায়তার আধিব্যাধিও স্বশরীরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কুষ্ঠ, প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি নানাব্যাধি এই কারণে দেহে সংক্রমণ করে। বোধ করি, বিধবার সহিত বিবাহ এবং বেশ্যাসংসর্গ ইত্যাদি, এই কারণেই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুর্ম্মতিবশতঃ লিঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া বৃহত্তর করিবার চেষ্টায় কেহ কেহ শূকদোষ জন্মাইয়া থাকে। যাহারা মূত্রত্যাগ করিয়া জল গ্রহণ করে না বা দুর্ম্মতিবশে স্নানের

প্রাক্‌কালে বস্ত্রমধ্যে মূত্র ত্যাগ করে কিম্বা অবগাহনসময়ে মূত্র ত্যাগ করিয়া স্নানের জল অপবিত্র করে, মূত্ররূপ গরলের প্রভাবে তাহাদের শরীরে অশেষ ক্লেশদায়ক কণ্ডুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ যৌবন-সঞ্চারে দুর্ব্বদ্ধিবশতঃ লোকে নানা অবিহিত পথে বিচরণ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে।

যৌবন বড় বিষম কাল। সৎসঙ্গ এবং সদুপদেশ দ্বারা পরিচালিত না হইলে যে কতপ্রকার বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পশুপক্ষ্যাদি কতকগুলি নৈঃসর্গিক বাধা লঙ্ঘন করে না। কিন্তু মনুষ্য উহা অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতে পারে। অতএব মনুষ্যের শাসন ও প্রকৃত পথানুসরণ জন্য বিধি-ব্যবস্থা বিশেষ কঠোর হওয়া আবশ্যক। হস্তমৈথুন অবলম্বনে অনেকে আপনার পরকাল নষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদের পিতা বা অন্য অভিভাবকগণ কামতত্ত্বে পুত্র বা প্রতিপাল্যের প্রকাশ্য অত্যাচার অদর্শন হেতু মনে করেন যে, আমার তত্ত্বাধীন ছেলেটি বেশ শুদ্ধ ও শান্ত। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বাধান ছেলেটী যে গোপনে আপন মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছে, ইহা স্বপ্নেও ভাবেন না। বাস্তবিক এদিকে অভিভাবকদিগের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন কার্য্যে অভ্যস্ত বালকদিগের চক্ষুর নিম্নভাগে কালির ন্যায় দাগ পড়ে এবং সর্ব্বদা অলস, স্ফূর্ত্তিহীন ও শয়নে অভিলাষযুক্ত দেখা যায়। উক্ত কর্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত হইলে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে এবং শরীরের নানাস্থান স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে। পুনঃপুনঃ হস্তের তাড়নে লিঙ্গের রগগুলি শিথিল হইয়া রগঢিলা লিঙ্গশৈথিল্য বা ধ্বজভঙ্গ রোগ উপস্থিত হয়। দেহের আনন্দপ্রদ পদার্থ শুক্রধাতুর ক্ষয় এবং বিকৃতিবশতঃ অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই হু হু ধু ধু করে। দাউ দাউ জ্বলিতে থাকে। মনে মনে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয় এবং বিশেষ স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। কামিনী দর্শন বা

স্পর্শ মাত্রেই শুক্র স্খলিত হয়। অভিভাবকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত এই সমস্ত হতভাগ্য বালকের ভবিষ্যৎ রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাকে সদুপদেশে উল্লিখিত দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যায় না বরং স্ত্রীসংসর্গের সুবিধা ঘটাইয়াও তাহাকে হস্তমৈথুনরূপ মহাপাপের হস্ত হইতে মুক্ত করা উচিত। যাহাদের উল্লিখিত অত্যাচারে শুক্রক্ষয় এবং লিঙ্গ-শৈথিল্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদের অনেকে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীসংসর্গে সাধ্য নাই ভাবিয়া নানা দুশ্চিন্তায় কাল হরণ করে। মৈথুন ত্রিবিধ, যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহারা তখন কেবল মানস মৈথুন করিয়া কাল ক্ষেপণ করে। মানস মৈথুন, অযোনিসঙ্গম-সুতরাং অনিষ্টকর হইয়া থাকে। চিকিৎসকদিগের এবম্বিধ অবস্থায় উল্লিখিত ব্যক্তির ভ্রমাপনোদন জন্য সাহস দিয়া ভামিনীসংযোগের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। ভ্রমাপনোদন জন্য দুই একবার মাত্র ভামিনীসংযোগ ব্যতীত শুক্রক্ষয় রোগে শুক্রক্ষয়ের ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে না।

প্রাচীনেরা স্ত্রীজাতিকে পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এবং পুরুষ জাতিকে শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। শশজাতীয় পুরুষের লিঙ্গ এবং পদ্মিনী স্ত্রীর যোনির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পারম্পর্য্যরূপে ক্রমেই বৃহৎ। অশ্ব ও হস্তিনী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি দোষ ও গুণ ইহাদের স্বভাবজাত। শশ জাতির সহিত পদ্মিনীর, মৃগ জাতির সহিত চিত্রাণীর, বৃষ জাতির সহিত শঙ্খিনীর এবং অশ্ব জাতির সহিত হস্তিনীর মিলন সুখ-সম্মিলন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। চারি জাতি স্ত্রীর সহিত চারি জাতি পুরুষের যতই অদূরে সম্মিলন, উহা অপেক্ষাকৃত সুখ-সম্মিলন, আর দূরে হইলেই অপেক্ষাকৃত দুঃখ-সম্মিলন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কর্ম্মকর্ত্তার দূরদর্শিতা ও যথাসাধ্য অনুসন্ধানের ফলে সুখের সম্মিলনই

বাঞ্ছনীয়। এই সমস্ত নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর ভবিষ্যৎ বংশের শুভাশুভ নির্ভর করে। কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সবিশেষ বিচার করিতে পারে না, সুতরাং অধোগতির পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে।

পদ্মিনীর নেত্রযুগল কমলদলের ন্যায় আয়ত এবং মৃগীলোচনবৎ সুদৃশ্য। নাসারন্ধ্র ক্ষুদ্র, তনু কৃশ, কেশ দীর্ঘ, অঙ্গ মনোহর, দেহ পদ্মগন্ধ, বেশ সুন্দর, কুচদ্বয় ঘনসন্নিবিষ্ট। অপিচ ইহাদের বাক্য মৃদু ও মধুর কণ্ঠ কোকিলের ন্যায় শ্রুতিসুখকর। মুখ সদাই হাস্যে পরিপূর্ণ, অঙ্গসমূহ সুলক্ষণে লক্ষিত। পদ্মিনীর স্নেহ সমভাবে সকলের প্রতি বিরাজমান। ইহারা পতিগতপ্রাণা এবং কটাক্ষে ভুবন মোহিত করে। এবম্বিধ মঙ্গলময়ী রমণী ধরাতলে দৃষ্ট হয় না। যে গৃহে পদ্মিনী বিরাজ করে, শোক ও দুঃখ তথা হইতে দূরে প্রস্থান করে। ভাগ্যফলেই এবম্বিধ রমণীরত্ন লাভ হইয়া থাকে। পদ্মিনী প্রথমা রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

চিত্রাণী নারীর স্তনযুগল কঠিন ও ঘনসন্নিবিষ্ট। দেহ নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব, নয়নযুগল কমলদলের ন্যায়। নাসা তিলপুষ্পসদৃশ। এই নারী মনোজ্ঞা, রতিরসজ্ঞা, লোভহীনা এবং সুশীলা হইয়া থাকে। ইহাদের দয়া এবং ক্ষমাগুণ শরীরে বিদ্যমান আছে। ইহারা মিষ্ট-ভাষিণী সত্য ও প্রিয়বাদিনী, পতিপরয়ণা, দেব ও দ্বিজে ভক্তিবিশিষ্টা। মতি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দিকে এবং অল্পমৈথুনেই প্রীতিযুক্তা হয়। পদ্মিনীর নিম্নেই চিত্রাণীর স্থান। চিত্রাণী দ্বিতীয়া রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

শঙ্খিনী নারীর নয়ন কমলদলের ন্যায়। দেহ দীর্ঘ ও স্তনদ্বয় কঠিন, বাক্য মধুর এবং কণ্ঠদেশ রেখাত্রয়ে বিভূষিত থাকে। ইহারা চঞ্চল-স্বভাবা, অপিচ দেহে ক্ষারগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। শঙ্খিনী নারী আলাপরসিকা মদনাতুরা। পতি বা গুরু প্রভৃতিকে ভয় করে না।

ইহারা কামাতুর হইয়া পরপুরুষের সহিত সর্ব্বদাই রতি বাসনা করে। শঙ্খিনীর নাসিকা উন্নত, সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্তা ও পিপাসাতুরা হইয়া অবস্থান করে। ইহারা অতিশয় উচ্চ হাস্য করে। চিত্রাণীর নিম্নে শঙ্খিনীর স্থান। শঙ্খিনী তৃতীয়া রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

হস্তিনী নারী সর্ব্বদাই কামবাণদগ্ধাবস্থায় বিরাজ করে। ইহাদের কেশ অল্প, দেহ এবং নাসারন্ধ্র স্থূল। নেত্র অগ্নিবৎ রক্তবর্ণ এবং গাত্রে মদ্যগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার কদা-চারে রত ও পরপুরুষের সহিত মৈথুনে অভিলাষিণী রূপে সর্ব্বদা বিরাজ করে। শঙ্খিনীর নিম্নেই হস্তিনীর স্থান। হস্তিনী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা এবং চতুর্থী রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

শশকজাতীয় পুরুষ সুশীল, গুণবান্, প্রিয় এবং সত্যবাদী। বাক্য সর্ব্বদাই মৃদু ও কোমল হইয়া থাকে। ইহাদের দেহে সর্ব্ব সুলক্ষণ লক্ষিত হয়। শশকজাতি পুরুষ শ্রীমান্, দেবপূজা ও সাধুসঙ্গ লাভে সর্ব্বদা অনুরাগী হইয়া থাকে। ইহাদের দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, ইহারা পরহিতে ব্রত। পরদারবিমুখ, গুরু ও দ্বিজপরায়ণ, অপিচ প্রকৃতি শান্ত, বচন গম্ভীর এবং মন পাপের পথে প্রবৃত্ত হয় না। শশক জাতি পুরুষের প্রথম শ্রেণীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মৃগজাতীয় পুরুষের বদন সর্ব্বদা হাস্যে পরিপূর্ণ, গাত্র স্নিগ্ধ ও অঙ্গ দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা বলবান্ ও নৃত্যগীতপ্রিয়। ইহাদের দৃষ্টি মৃগের দৃষ্টির ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল। ইহারা ভগবানের গুণ কীর্ত্তনশ্রবণে নিতান্ত অভিলাষী। অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি পূজা ও সৎকারপরায়ণ হইয়া থাকে। মৃগজাতি পুরুষের দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বৃষজাতীয় পুরুষের অঙ্গ শোভাযুক্ত। ইহারা গুণবান্ ও শীলবান্। ইহাদের শরীরে পুগগন্ধ অনুভূত হয়। রসনা দীর্ঘ হইয়া

থাকে। বৃষজাতি পুরুষের চরণদ্বয় হ্রস্ব, কলেবর হৃষ্টপুষ্ট। ইহারা স্বভাবতঃ লজ্জাবিহীন। ইহাদিগের নারী দর্শনমাত্রেই মন উৎফুল্ল হয় ও পাপের ভয় নাই। এই জাতীয় পুরুষ নিদ্রাপ্রিয় নহে। পরন্তু সর্ব্বদাই মৈথুনপ্রিয় হইয়া থাকে। বৃষজাতি পুরুষের তৃতীয় শ্রেণী-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অশ্বজাতীয় পুরুষের অঙ্গ দীর্ঘ ও কর্কশ। গমন দ্রুত, মন নির্ভীক এবং সর্ব্বদা কদাচারে রত থাকে। ইহারা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, মহাপাপী, ধর্ম্মবুদ্ধিবিহীন। পরনিন্দাপরায়ণ এবং সর্ব্বদা মদনবাণে সন্তপ্ত অব-স্থায় কালযাপন করে! অশ্বজাতীয় পুরুষ প্রায়ই স্থূলকায়, সর্ব্বদা উগ্র-স্বভাব এবং দিবারাত্রি কেবল নারীদর্শন লালসায় ব্যাকুল থাকে। নারীকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই পুনঃপুনঃ সঙ্গম করে। শতনারীতে শতবার উপগত হইলেও ইহাদের আন্তরিক তৃপ্তির সঞ্চার হয় না। অশ্বজাতীয় পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও পুরুষের চতুর্থ শ্রেণীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যোগ্য পুরুষের সহিত যোগ্যা নারীর সম্মিলনের ন্যায় কামতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঋতুবিবরণ, সহবাসবিধি, স্ত্রী-সম্ভোগের কালাকাল, কাল ও কারণ ভেদে নারীসহবাসের ফলাফল, সন্তানের অকালমৃত্যুর কারণ, সহবাসদোষে, সন্তানের অবস্থা, কোন্‌জাতীয়া নারীর কোন্‌জাতীয় শয্যা আবশ্যক ও তাহাদের চিত্তরঞ্জনের উপায়, অপিচ গর্ভাবস্থায় কোন পীড়া হইলে তাহার ঔষধনিরূপণ ইত্যাদি শাস্ত্রের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হয়। যিনি শাস্ত্রের আদেশ পালনে যে পরিমাণে ভ্রম করেন, তদ্দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ সেই পরিমাণে দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

নারীজাতি রজস্বলা হইলে প্রথম তিন দিবস বর্জ্জনীয়া। চতুর্থ দিবসে স্নানপূর্ব্বক বিশুদ্ধা হইলে সম্ভোগের যোগ্যা হইয়া থাকে।

যাহার নারীগমনের কালাকাল বিচার নাই, তাহার জন্য নরকের পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীর দিনে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে আয়ুক্ষয় হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রসাধিক্য-কারিণী তিথিদ্বয়, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিদ্বয়, রবিবার এবং সংক্রান্তি দিনে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। কোন শুভ কার্য্যে যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীসংসর্গ মহাপাপরূপে পরিগণিত। উহা সংকল্পিত কার্য্যের পদে পদে বিঘ্নজনক বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। ঋতু-কালে কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হইতে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে যে সন্তান জন্মে তাহারা অল্পায়ু ও চিররোগী হইয়া থাকে। দিবাসঙ্গমে আয়ুক্ষয় হয়। উহাতে পুত্রাদি জন্মিলে তাহারা মহাপাপী হইয়া থাকে। পুষ্পহীনা বৃদ্ধানারীর সহিত সংসর্গ সম্পূর্ণ অনুচিত। নিশাকালে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে যাম অর্থাৎ প্রহর ভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম প্রহর স্ত্রীসম্ভোগের পক্ষে একেকালেই নিষিদ্ধ। রোগার্ত্তা বিশেষতঃ কোন ব্যাধি কর্ত্তৃক দূষিত বা বিকৃতযোনি স্ত্রীর সহিত রমণ নিতান্তই হেয় ও অনুচিত। উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাল ভিন্ন ঋতুপ্রাপ্তির পর ষোল দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গ করা যাইতে পারে। পরন্তু পুনরায় রজস্বলা না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না। প্রকৃত সংযমী লোকের পক্ষে ঋতুস্নানের পর একদিন মাত্র স্ত্রী-সংসর্গ করা উচিত। পুনরায় ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত আর সেই নারীর সহিত সঙ্গম করিবে না।

প্রথম ঋতুদর্শনদিনে কামিনীর পদাঙ্গুষ্ঠে কামের উদয় হয়। প্রাচীনেরা চন্দ্রকলার ন্যায় কামের প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি ক্রমে কলা বিভাগ করিয়াছেন। ঋতু উৎপত্তির প্রথম দিন শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ্, ক্রমে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি। শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্ণয়

করিয়াছেন যে কাম শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিনে পদাঙ্গুষ্ঠে বাস করে। দ্বিতীয়ায় গুল্‌ফে, তৃতীয়ায় উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগদেশে, পঞ্চমীতে নাভিস্থানে, ষষ্ঠীতে কুচমণ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে কক্ষদেশে, নবমীতে কণ্ঠদেশে, দশমীতে স্কন্ধদেশে, একাদশীতে গণ্ড-দেশে, দ্বাদশীতে নয়নে, ত্রয়োদশীতে শ্রবণে, চতুর্দ্দশীতে ললাটে এবং পৌর্ণমাসীতে শিখা স্থানে অবস্থান করেন। কৃষ্ণপক্ষে বিপর্য্যয় ভাবে ক্রমে নিম্নে আসিয়া অমাবস্যার দিনে পদাঙ্গুষ্ঠ হইয়া অস্ত যায়। অন্যান্য নিষিদ্ধ দিনের ন্যায় কামের একাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে সহবাস নিষিদ্ধ। পুরুষের কামকলা প্রকৃত চন্দ্রকলার সহিত সমভাবে উদয় ও অস্ত যায়। কামের গতিপথে কর্ণ অতি প্রধান স্থানরূপে পরিগণিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্পবয়সেই কামপ্রবৃত্তি চঞ্চল হয়। বোধ করি উহা সাম্যের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ যৌবনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই কর্ণবেধ করা বা চূড়াকরণ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। মুসলমান ব্যবস্থাপকগণও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কামচাঞ্চল্য নিবারণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুন্নত অর্থাৎ শিশ্নত্বকচ্ছেদের প্রথা দৃষ্টিতে উহাই প্রতীত হয়। কাম যে দিন যে স্থানে অবস্থিতি করেন, কামতত্ত্বজ্ঞ গুরুদিগের উপদেশ মত সেই বিশেষ স্থান পীড়ন বা অন্য আবশ্যকীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলে কামিনীর দ্রাবণ হইয়া থাকে। কামিনীর দ্রাবণ না হইলে রমণজনিত হর্ষের পূর্ণোদয় হয় না, সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহ দোষযুক্ত হয়। প্রাচীন কালে কামতত্ত্বদর্শিগণ স্ত্রীজাতিকে দ্রব করিবার জন্য বহুবিধ বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গমকালে আবশ্যক মত বন্ধের ক্রম অনুসারে নারীকে আবদ্ধ করিয়া সুরত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চিতরূপেই সেই স্ত্রী দ্রব হইয়া থাকে। শয়ন, উপবেশন, প্রভৃতি নানা অবস্থায় স্ত্রীদিগকে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। বন্ধের ক্রম অনুসারে নারীকে

আবদ্ধ করিয়া শৃঙ্গার করিলে শশক জাতীয় পুরুষও হস্তিনীকে দ্রব করিতে পারে। পক্ষান্তরে পদ্মিনীও অশ্বজাতীর সহিত রমণে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে না। কামতন্ত্রের যে ভাগেই দোষ আচরিত হউক, অনুপাতানুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এতদুভয়ের মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষিত নাম গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। কামশাস্ত্রে মনুষ্যের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত থাকা নিতান্তই উচিত। প্রাচীন কালে শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ গুহ্য ছিল, এখনও আমাদিগের গুহ্যভাবই রক্ষা করা উচিত। পিতৃপুরুষগণ আমাদিগের রক্ষাউদ্দেশ্যেই তন্ত্রশাস্ত্র সকল এবং করচা গ্রন্থ প্রভৃতি অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও উহা পাঠ মাত্রে মূল গুহ্য বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু ভাগ্যফলে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ হইলে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কামতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক প্রচারে ইংরেজরাজের অনুরাগের ত্রুটী আছে। বরং বিরাগ থাকা হেতু মুদ্রিত গ্রন্থ পূর্ব্বে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালে দুই একখান পুস্তক মুদ্রিত পাওয়া যায়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদাৎ কালে এই সমস্ত অসুবিধা দূর হইবে। মূলতত্ত্ব জানার জন্য যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ আছে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে হস্তলিখিত বহু গ্রন্থ পাইতে পারেন। শুক্রধাতুর ক্ষয় ও বিকৃতি নিবারণ, অপিচ অচল, অটল ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষার প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই তন্ত্রশাস্ত্র-প্রকাশক মহর্ষিদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিহার ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই স্থানেই শেষ হইল।

হিন্দুসন্তানগণ আহার, নির্হার ও বিহার এই তিনটী ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধের নিকট সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধগুলি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বিহারবিধি অতি সংক্ষেপে

বর্ণিত, কিন্তু তন্ত্রাদিশাস্ত্র ও করচাগ্রন্থ প্রভৃতিতে উহার বিস্তারিত উপদেশ আছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ জাতি হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্মৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। কঠিন সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা ছিল। হেতুনির্দ্দেশ স্মৃতিলঙ্ঘনের পন্থা স্বরূপ। অতএব ব্রাহ্মণগণ হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক স্মৃতিলঙ্ঘনের পরিবর্ত্তে পাপ স্পর্শ করিবা মাত্র, দ্রুতপদে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি সাধন করিতেন; নতুবা তিনি সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন। কেহ মূত্র ত্যাগ করিয়া জল গ্রহণ করিল না, অন্যে দূরে থাকুক, পিতা মাতা সহোদর প্রভৃতিও তাহার স্পর্শ করা আহার্য্যগ্রহণ বন্ধ করিতেন। সুতরাং দোষীকে ব্যকুলতা সহকারে শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইত। শুদ্ধাচাররহিত দোষী ব্যক্তির সহিত সংশ্রবে, স্বশরীরে দোষ সংক্রমণের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধাশুদ্ধবোধশূন্য হীনাচার ব্যক্তির সহিত কদাচ মিশিতেন না। আহারের বিশুদ্ধতা বিশেষ বাঞ্ছনীয়; ব্রাহ্মণগণ পবিত্রাপবিত্র-বোধশূন্য যে, সে লোকের হস্তে পাকক্রিয়ার ভার ন্যস্ত না করিয়া স্বপাক বা নিজের তুল্য সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্নই গ্রহণ করিতেন। উক্ত কার্য্যে ইতর শ্রেণীর সহিত সংশ্রব, তাঁহাদের অভ্যাস এবং জাতীয় রীতির বিরুদ্ধ ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের অনুকরণে আপন সম্প্রদায় অপেক্ষা হীনক্রিয় শ্রেণীর হস্তে অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না।

যদিও মনুষ্য মাত্র স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কর্ম্মকাণ্ডে গুরু ও মহাজনদিগের বিধি ও নিষেধের নিকট সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকাই উচিত; তথাপি সকলে সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকে না। অনেকের বহুবিধ শিথিলতাও আছে। অনেকে আপন ক্ষীণ বুদ্ধিতে হেতুনির্দ্দেশ দ্বারা স্মৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জাতি হেতুনির্দ্দেশ দ্বারা স্মৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেন না? স্মৃতিশাস্ত্রের Loyal Subject (লয়্যাল সাবজেক্ট) ছিলেন বলিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্ত

হইতেন। কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি জাতি শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিলেও ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায় কিঞ্চিৎ শিথিলতাও আছে। পরস্পর তুলনা করিলে তিলী, মালী, কামার, কুমার প্রভৃতি জাতির শিথিলতা কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতির শিথিলতা যৎপরোনাস্তি অধিক। যে সম্প্রদায় শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ পালন সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসর, তাহারা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় অপেক্ষা অনুপাতানুসারে উচ্চতর পদ ও সম্মানে অবস্থিত। স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ পালন হেতুই ব্রাহ্মণজাতি সমাজের শীর্ষস্থানে এবং উহার অপালন হেতুই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নতম স্থানে অবস্থিত আছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে স্মৃতিশাস্ত্রের Loyal subject (লয়্যালসাবজেক্ট) গুলি সমাজের উচ্চতম পদ এবং Lawless gallant (ললেস গ্যালাণ্ট) গুলি নিম্নতম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র পদদলন করিলে সমাজে পদদলিত হইতে হয় জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু-জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অবিচলিত ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চারিটী মাত্র জাতি ছিল, এখন শত শত জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে বর্ণসঙ্করের সংখ্যাও যথেষ্ট। কিন্তু এই সকল জাতি, শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন ও অপালনের অনুপাতে সমাজে পূজ্য বা হেয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জনক ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশ পালন করিয়াই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন আরম্ভ করিলে এখনও সমাজে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করা যায়। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন না করিয়া কোন সম্প্রদায় গায়ের জোড়ে ডবল প্রমোশনের জন্য লালায়িত হইলেই বিষম সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালনই সামাজিক সম্মান লাভের এক মাত্র উপায়।

হিন্দুগুরুগণ কোন ব্যক্তিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত (Baptize) করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। যেহেতু আত্মজ্ঞানমূলক সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যেক জীবই দীক্ষিত আছে। সকাম বা নিষ্কাম মতের দীক্ষা ব্যতীত "হিন্দুধর্ম্মে" দীক্ষা দেওয়া বা (Baptize) (ব্যাপ্‌-টাইজ) করিবার নিয়ম হিন্দুর শাস্ত্রে নাই। অপর মধ্যভাগে একটী কথা এই যে, "মহিলাকুল পিতার কি পতির?" এই পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসা এই যে, পতির। এই বাক্যের উপর হিন্দুর জাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত। উহা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত এবং রাজার পোষণে পরিপুষ্ট। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু জাতি দুইটী পৃথক্ কথা। * সকাম ও নিষ্কামের প্রণালী বিভিন্ন হইলেও স্বমতের গুরু এবং মহাজনদিগের বিধি ও নিষেধের নিকট অবনত মস্তকে থাকিতে হইবে। উহাতে প্রকৃত হিন্দুর কোন আপত্তি নাই বা হইতে পারে না। ইহাই হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ড। বঙ্গীয় হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে একটী বিষয় ধারণা হয় যে, কর্ম্মে নিবিষ্ট হইবার প্রথমেই দৈনিক পঞ্জিকা দর্শন অর্থাৎ (দৈনিক্ রুটিন) আলো-চনা ও কামনা নির্ণয় করিয়া পরে অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কেবল পাঁচ ঘণ্টা কাল রুটিন ডিউটী করিয়া থাকে, কিন্তু এ রুটিন দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পাঠ করিলে ইহাও হৃদ্বোধ হয় যে, বিহিত উপায়ে রুটিন ডিউটী অর্থাৎ সময় নিরূপণপূর্ব্বক কর্ত্তব্যগুলি বিহিত পথে সম্পাদন করিলেই স্বধর্ম্ম পালন

---

* যেদিন মণিরাম কলিতা vs কেরী কলিতানীর এক্স পার্টি প্রিভিকৌন্সিল আপিলের মোকর্দ্দমায় প্রিভিকৌন্সিল হতভাগ্য মণিরামের বা প্রকৃত পক্ষে সমস্ত হিন্দুজাতির বক্ষে তীক্ষ্ণধার রাজকীয় ছুরিকা বসাইয়া দেন, হায় রে! সেই দিন হিন্দুর জাতি-পাত হইয়া গিয়াছে। কোন জাতির মূল সূত্র বিনষ্ট হইলে প্রকৃতির নিয়মে সেই জাতির অস্তিত্ব-লোপ অবশ্যম্ভাবী।

করা হয়। বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট রুটিন অনুসারে বিহিত উপায়ে যথাসময়ে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে দেখিলেই স্বধর্ম্মপালন করিতেছে, আর ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেই অধর্ম্মের প্রশ্রয় হইয়াছে, বুঝিতে হয়। শিশুদিগকে রুটিন ডিউটী করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্বধর্ম্মপরায়ণ করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু রুটিন দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। অতঃপর মুক্তি ও সাধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রস ধাতুই দেহরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিবিধ রোগসমুদ্র হইতে পরিত্রাণ অর্থাৎ পার হওয়া যায় জন্যই উহার অন্য নাম পারদ হইয়াছে। বস্তুতঃ পারদ পার—দ পদার্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ রস ধাতুকে মহাদেবের বীর্য্যস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। রস বা পারদ ধাতুতে নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, বিষ, গিরি, চাঞ্চল্য ও অসহ্যাগ্নি এই আটটী নৈসর্গিক এবং সপ্ত কঞ্চুক দোষ বর্ত্তমান আছে। শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে উল্লিখিত দোষগুলি বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত পারদের ন্যায় দেহের অনিষ্টকর পদার্থ আর নাই। শুদ্ধি, মূর্চ্ছা, বন্ধ ও মারণ এই চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্মের দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে পারদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ জগতে আর নাই। মনুষ্য জাতিকে রক্ষার জন্যই শিবশাস্ত্র তন্ত্রে মঙ্গলময় রস-কর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। যথাশাস্ত্র চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম সম্পাদিত হইলে পারদের অমোঘ রোগনাশক শক্তি সঞ্চার হয়। হিন্দু চিকিৎসকগণ উহার সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। পারদের বন্ধ ও মারণ প্রণালী বুঝি বা লোপ হইয়াছে। সাধকলোকের অভাবে এখন আর উক্ত কার্য্য হয় না। শুদ্ধি ও মূর্চ্ছাপ্রণালী এখনও প্রচলিত আছে। রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দুর, ষড়্গুণ বলিজারিত সাধারণ বা সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রভৃতি পারদের মূর্চ্ছাপ্রণালীর অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রানুসারে পারদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে পরিগণিত।

আহার্য্য পদার্থের সারাংশ যাহা দেহের ক্ষয়পূরণ জন্য গৃহীত হয়, তাহাকে রস কহে। উক্ত রসধাতুর শেষপরিণতি শুক্রধাতুই প্রকৃতপক্ষে দেহের সর্ব্বপ্রধান রস। যোগিগণ শুক্ররসকে দেহস্থ পারদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। গুরুর নিকট দেহস্থ পারদের শুদ্ধি, মূর্চ্ছা, বন্ধ ও মারণ এই চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম বিদিত হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে দেহরক্ষার জন্য অন্য ঔষধের প্রয়োজন হয় না। কেবল স্ত্রীসংসর্গ বন্ধ করিলেই বীর্য্যধারণ সাধন হইয়া দেহের পারদ প্রকৃত পার-দরূপে পরিণত হয় না। বীর্য্যধারণের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রণালীর সাধনশিক্ষা আবশ্যক। এই সকল বিশেষ গুহ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে রজঃ মহাশক্তি এবং বিন্দু মঙ্গলময় শিবস্বরূপ; আনন্দদ্বার যোনি ও লিঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটী বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রচার শুনুন। "বীজ ঔর ফুল দুনিয়াকা মূল।" বীজ এবং ফুল এই দুইটী সাধনার প্রধান উপাদান। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের স্থূলতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম ভাবে রজঃ ও বীর্য্যের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। পাঠক! এই স্থানে আমার লেখনী অচল হইল। যাঁহার ইচ্ছা আছে, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং সদ্‌গুরু অবলম্বনে বিস্তারিত অবগত হউন।

রসের সাধনে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ। শাস্ত্রে পৌরাণিক প্রমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, ভূতভাবন ভবানীনাথ শ্যামা-পদতলে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণে পতিত হইয়াছিলেন। সকাম-সাধনা কালে আদ্যা বা অর্দ্ধাঙ্গিনীর চরণে শরণ লইতে হয়। স্ত্রীজাতি কখন বাঘিনীরূপে পুরুষের কণ্ঠচ্ছেদ করে; আর কখনও বা মহাশক্তিরূপে সাধনসঙ্গিনী হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে। পুরুষ সাধনার দ্বারা উর্দ্ধরেতা হইয়াছে এবং তাহার বীর্য্য অমোঘ ভাব ধারণ করিয়াছে কি না একমাত্র স্ত্রীজাতিই উহার অগ্নিপরীক্ষার স্থল। গুরুর কৃপায় যিনি সাধনা দ্বারা এই অগ্নিপরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ধন্য। সাধনা দ্বারা শুক্র-ধাতুর স্থিরতা না জন্মিলে মনের স্থিরতা জন্মে না। মন প্রাণ-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া একাগ্র হইলে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে বটে কিন্তু অগ্রে সাধনার দ্বারা দেহের পারদ সিদ্ধ না হইলে সমস্তই বিফল। প্রবল ধ্যান (চিন্তা) করিলে শুক্রক্ষয় হয়, উহাতে একাগ্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া একাগ্রতা নষ্ট করে। সাধনা দ্বারা শুক্রধাতু অচল, অটল, এবং সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত একাগ্র ধ্যান অসম্ভব। শুক্রসিদ্ধি হইলে আর ক্ষয় বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না; অচল ও অটল অবস্থায় থাকে। শিব ও শক্তি উপাসকদিগের মতে যোনি ও লিঙ্গ; ধ্যেয় ব্যতীত হেয় পদার্থ নহে। কামেন্দ্রিয় সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়ায় গুহ্যভাব রক্ষা করা আবশ্যক বটে, তদ্ব্যতীত আনন্দদ্বার রক্ষায় যাহার যত্ন নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উদাসীন সে যে একজন মহাদুঃখী ও মহামূর্খ তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নানের পূর্ব্বে লিঙ্গ ও অণ্ড প্রভৃতিতে সর্ষপ বা করঞ্জ তৈল প্রভৃতি অভ্যঞ্জন এবং গুরূপদিষ্ট অন্যান্য পরিচর্য্যাও নিতান্তই আবশ্যক; ভ্রম করিলে আনন্দযন্ত্র বিকৃত হয় এবং রসাতলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নানান্তে শাক্তের ন্যাঙট ও রুমালী এবং বৈষ্ণবের পক্ষে ডোর ও কৌপীন অন্তর্ব্বাসরূপে ব্যবহার মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। আহারে মুখ, নির্হারে গুহ্য, এবং বিহারে যোনি বা লিঙ্গ এই তিনটীই প্রধান দ্বার। উহার কোনটীই উপেক্ষার বস্তু নহে।

আহার, নির্হার ও বিহার-ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধের নিকট পূর্ণরূপে অবনতমস্তক হইলে দেবদেহ বা নির্জ্জর অবস্থা লাভ করা যায়। উক্ত কার্য্যে ব্রাহ্মণজাতি সকলের শীর্ষ-স্থানীয় থাকায় হিন্দু সাধারণ কর্ত্তৃক ভূদেব নামে অভিহিত হইতেন। ভারতীয় ভূদেবগণের বিশুদ্ধমস্তিষ্ক-প্রসূত শাস্ত্ররূপ রত্নরাজি পৃথিবীর

প্রভূত উপকার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। হায় রে! পৃথিবীর "মহাগুরু" ব্রাহ্মণ জাতি কোন্ অজ্ঞাত পাপের ফলে ইংরেজ-রাজত্বে সংসার হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ব্রাহ্মণকৃত পৃথিবীর উপকার কখনই ভুলিবার যোগ্য নহে। বৃটিশসিংহের রাজত্বে মানবের মহান্ এবং অত্যুচ্চ আদর্শস্বরূপ ব্রাহ্মণ জাতির পতন একটী বিশেষ শোচনীয় দুর্ঘটনা। হা বিধাতঃ! সমাজযন্ত্র এবং সংসারতন্ত্রের মূলীভূত পৃথিবীর বিশেষ উপকারক ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা কর।

দেব অবস্থা হইতে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব হইবার চেষ্টাই হিন্দুসাধনার চরম উদ্দেশ্য। তন্ত্রে উক্ত আছে যে, যত জীব, তত শিব। মনুষ্য চেষ্টা করিলে সাধনা দ্বারা শিবত্ব লাভ করিতে পারে। শিবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে বিভিন্ন মুখে ধাবিত কামের গতি নিরোধপূর্ব্বক "শিবোহং" অন্তরে এই কামনা দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সকামসাধনার এই অংশকে অনেকে নিষ্কাম বলেন। যেহেতু মহাদেব সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের অবতার। তিনি ধ্যেয় বস্তু হইলেই প্রকারান্তরে নিষ্কামধর্ম্ম যাজন করা হইল। যাঁহারা শক্তি-উপাসক, তাঁহারা জানেন যে শিব-উপাসনা ব্যতীত শক্তির উপাসনা হয় না। তন্নিবন্ধন সকামত্ব দূর হয় না। মহাদেব হইতে হইলে 'আমি শিব হইব' তখন অন্তরে ইহাই বিশেষ কামনা। কোন বিশেষ কামনা সাধনার ইচ্ছা হইলে, বিপরীত-মুখী কামনা সংযত করা স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ক্রিয়াগুলি কোন কোন অংশে নিষ্কামের ন্যায় হইলেও উহা সকাম ব্যতীত নিষ্কাম ধারণা করা সঙ্গত নহে। সকামধর্ম্মে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা ছাড়া নাই।

দেহের প্রধান রস শুক্র বা পারদই আনন্দের আধারস্বরূপ, আনন্দ নাশই জীবের মৃত্যু। সুতরাং আনন্দের আধার শুক্র ধাতুই জীবাত্মার আসনরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সাধনা দ্বারা শুক্রের ক্ষয় ও বিকৃতির পথ রুদ্ধ করিয়া অচল ও অটল অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সদানন্দ বা

মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। তখন ধ্যান, ধারণা ও সমাধির পক্ষে সু-অবসর উপস্থিত হয়। কুম্ভকের সাহায্যে প্রধানতঃ বিন্দুসিদ্ধি হইয়া থাকে। যোগী তখন পরিচয় অবস্থা হইতে অন্যান্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে নিষ্পত্যবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অল্পাহার, অল্পমল প্রভৃতি কতকগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি তখন স্বতঃসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। বিন্দু সিদ্ধি হইলে আহার পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক করে। আহার পরিবর্জ্জন করিতে হইলে একখণ্ড নারিকেলাস্থি গ্রহণ করিতে হয়। উহার যে অংশ পর্য্যন্ত তণ্ডুল বা ময়দায় পূর্ণ করিলে জীবের পরিতোষপূর্ব্বক আহার হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিয়া অতিরিক্ত ভাগ বিনষ্ট করিতে হয়। পরে অভ্যাস মতে তণ্ডুল বা ময়দার দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়া সেই পরিমাণবিশিষ্ট আহার্য্য মাত্র প্রতিদিন গ্রহণ করিতে হয়। অপিচ একটী কষ্টি পাথর রাখিয়া প্রতিদিন নির্দ্ধারিত সময়ে প্রোক্ত নারিকেলাস্থিকে উহার উপর একবার ঘর্ষণ করিতে হয়। প্রতিদিবসের ঘর্ষণে নারিকেলাস্থি অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আহারও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অথচ ক্লেশ হয় না। আহার-জয়ের জন্য সঙ্গে সঙ্গে খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করা আবশ্যক।

জিহ্বার অংশবিশেষ নিম্নে তন্তুবৎ পদার্থ দ্বারা আবদ্ধ আছে। প্রথমে গুরু-উপদেশমত সেই তন্তুবৎ পদার্থের কিয়দংশ কাটিয়া দিতে হয়। ক্ষত শুষ্ক হইলে নবনীত দ্বারা জিহ্বা মালিশ করিয়া আয়স-নির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলার সাহায্যে উহার নির্লেখন করিতে হয়। ইহা নিয়ম পূর্ব্বক অভ্যাস করিলে জিহ্বা কিঞ্চিৎ দীর্ঘত্ব ও কোমলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন গুরূপদিষ্ট খেচরী মুদ্রা অভ্যাসের ক্রম অনুসারে জিহ্বাকে তালুস্থিত রন্ধ্রে, প্রবেশ করাইতে হয়। প্রথমে জিহ্বায় লবণ ইক্ষু প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের রস অনুভূত হয়। পরে যখন জিহ্বাগ্রভাগ রন্ধ্র পথে ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্ম পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তখন

উক্ত পদ্ম হইতে নিঃসৃত চন্দ্রামৃতধারা পান করিতে আরম্ভ করে। জিহ্বাগ্রভাগ উল্লিখিত চন্দ্রামৃতধারা পান করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষুৎ-পিপাসার উৎপত্তি আর থাকে না। কোন প্রকার আহার্য্য বা পানীয় গ্রহণ আবশ্যক হয় না। আহার-জয়ের পূর্ব্বে শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সিদ্ধ করিতে হয়। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আণ্ডামানবাসী উলঙ্গ মানবগণ রন্ধন, গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কোন কার্য্যই জানে না; অথচ শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি নানা দ্বন্দ্ব সহ্য করিয়া বিনা ক্লেশে অন্যান্য পশুর ন্যায় প্রকৃতির ক্রোড়ে বিচরণ করিতেছে। যোগী পুরুষ ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা উল্লিখিতরূপ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা সিদ্ধ করিতে পারেন। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সিদ্ধ হইলে পৌষের শীতে জলাশয়ে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মে অগ্নিবেষ্টিত স্থানে অবস্থান করিলেও কোন ক্লেশের উৎপত্তি হয় না। বিন্দুসিদ্ধির পর আহার্য্যগ্রহণ বন্ধ এবং দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সিদ্ধ হইলে মনুষ্য মৃত্যুঞ্জয় হয়। মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ধ্যান, ধারণা ও সমাধির সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহ জীবরূপিণী প্রকৃতির সহস্রার পদ্মের উপরিস্থ আপন পতি পরমশিবের নিকট গমন সম্বন্ধে অবারিত দ্বার হয়। কেবল লয়-যোগে পরমব্রহ্মে লীন হইয়া দুঃখাগ্নির মহানির্ব্বাণ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, অন্যান্য কামনা-ক্ষয় অর্থাৎ বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত পরমব্রহ্মে একাগ্র হওয়া যায় না। যে কামের অস্তিত্বটুক থাকে, তাহাই তাহাকে একাগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশান্তরে লইয়া যায়। সুতরাং পুনরায় অধোগতি হয়। জন্মান্তরপরিগ্রহ ব্যতীত সেই জন্মে তাহার প্রকৃত মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। সকাম গুরুগণ ইহা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, শিব ও শক্তির লীলাই তদীয় ভক্ত এবং উপাসকবৃন্দের আদর্শস্থল। কাম-

তত্ত্বের প্রথমাবস্থায় মহাশক্তিস্বরূপা সতী নিজ পিতা দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞে যাইতে স্বামীর অনুমতি না পাইয়া কত কি করিলেন। ভয়নাশিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভীত ও স্তম্ভিত শিবকে অনুমতি দিতে বাধ্য হইতে হইল। সতী পিত্রালয়ে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। পরে আবার পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। এদিকে ভোলানাথ সংবাদ পাইবামাত্র সদানন্দমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মহারুদ্ররূপে শ্বশুরভবনে উপস্থিত হইলেন। ভূত-প্রেতাদি অনুচরগণের নানা বীভৎস অনুষ্ঠান ও সমস্ত লণ্ডভণ্ড করার পর ইঙ্গিতে শ্বশুর-বেচারার মুণ্ডটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দেব ধূর্জ্জটি কামতত্ত্বের প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত করিলেন। পরে শাশুড়ীর অনুনয়ে শ্বশুরের পুনর্জীবন দান করিলেও মনের আবেগ পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হওয়াতে নৃমুণ্ডের পরিবর্ত্তে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া দিলেন এবং দস্তুর মত Apology (এপলজি) না পড়াইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। পরে আবার মৃত পত্নীর দেহ স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বাবা ভোলানাথের এই অবস্থা মোচন জন্য দেবতাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। বিষ্ণু ছিলেন, তাই চক্রীর চক্রে সমস্ত গণ্ডগোল শেষ হইল।

বাবা ভোলানাথ অতঃপর কামতত্ত্বের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন তিনি অখণ্ড, অচল ও অটল মহাযোগী। মন্মথ কুসুম-শরসাহায্যে মহাদেবের মন মন্থন এবং ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়া নিমেষে ভস্ম হইলেন। "মহাদেবের কপাল হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কামদেবকে অঙ্গারে পরিণত করিল। শাক্ত উপাসকগণ কামতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে আবশ্যক হইলে পিতৃদৃষ্টান্তের অনুকরণে শ্বশুরের মুণ্ড পর্য্যন্ত ছিঁড়িতেও ইতস্ততঃ করেন না। উক্ত তত্ত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাদেবের ন্যায় নিমেষে কামকে ভস্ম করেন। দেহস্থ রস বা পারদের চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, মদনের

আশ্রয়স্থান শুক্রধাতুর ভস্ম বা মারণ অতি সহজেই সম্পাদিত হয়। এজন্য ইহাকে সহজ ভজন কহে। যাঁহারা বিবিধ মসলা মিশ্রিত করিয়া গুরূপদেশ মত শুক্রধাতুর ভিয়ান দিতে অশক্ত তাঁহারা চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম-বিশিষ্ট আকরিক পারদের সাহায্য লইয়া অথবা খণ্ড জন্মগ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করিতে পারেন। যোগী ভ্রাতাদের সহিত আলাপে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রস-কর্ম্মবিশিষ্ট পারদ অপেক্ষা তান্ত্রিক মতে রসকর্ম্মবিশিষ্ট পারদই অভীষ্ট-সাধনের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আকরিক পারদের রসকর্ম্ম সম্পাদনে কোন ভ্রম থাকিলে উহার কুফল ভোগ না করিয়া দেহের নিস্তার নাই। এ জন্য গুরুর নিকট দৈহিক পারদের ভিয়ান শিক্ষাই বিশেষ বাঞ্ছনীয়। বিবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা নানা প্রকার বিভূতি লাভ হইলে নিষ্কামগণ শুষ্ক উপাসনা দ্বারা শত বৎসরে যে কাম ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না, সকাম উপাসকগণ তাহা শতমাস, শত সপ্তাহ বা শত দিন মধ্যে অনায়াসেই ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। সকাম গুরুদিগের উপদেশ এই যে, যাঁহারা সাধক নহেন, নানা মোহে মুগ্ধ এবং বদ্ধজীবরূপে পরিগণিত তাঁহা-দিগের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান ও সাধনরূপ অঙ্কুশ দ্বারা মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে প্রকৃত পথে চালাইতে সমর্থ, তাঁহাদিগের অনর্থক দীর্ঘকাল শুষ্ককাষ্ঠ-চর্ব্বণ বা নিষ্কামপথাবলম্বনে সংসার-কর্ত্তনের প্রয়োজন দেখা যায় না।

যাঁহারা সাধনা দ্বারা শিবত্ব বা মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আহার্য্যগ্রহণ বা মল-মূত্রাদিত্যাগ প্রয়োজন হয় না। তখন তাঁহাদের আত্মা সর্ব্বদাই জাগ্রত; পরন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি থাকে না। অপিচ মূর্চ্ছা বা মৃত্যুও উপস্থিত হয় না। প্রায় সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি এবং জিহ্বার নিগ্রহ প্রাপ্তি হয়। কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহপ্রাপ্তি হইলেও তখনও মনের নিগ্রহ হয় না। ব্রহ্মেন্দ্রিয় মন। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়

উভয়াত্মক অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটী ইন্দ্রিয়ের যাহা কিছু বিষয় বা অবলম্বন তৎসমস্তই মনে বর্ত্তমান আছে। অতএব মনের নিগ্রহ ব্যতীত চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না; মন জগৎপ্রপঞ্চে ভ্রমণপূর্ব্বক প্রকৃত মোক্ষের জন্য একতান হইতে পারে না। সাধনা দ্বারা সহজ-শিবত্ব লাভ হইলে পরম-শিবত্ব লাভের জন্য "শিবোহং" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার ধ্যান ব্যতীত, অন্য কোন মন্ত্র জপ আবশ্যক হয় না। এই সময়ে পরমাত্মার ধ্যানও অনাবশ্যক। আমি স্বয়ং শিব, আবার কোন্ শিবের ধ্যান করিব? ইহা নিশ্চয় করিয়া মনকে দৃঢ় করিতে হয়। 'শিবোহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র নিশ্চয়তা হেতু সেই যোগীর অন্তর্ভাগ ব্রহ্মময় হয়। বহির্ভাগও সর্ব্বদাই ব্রহ্মময় আছে। কেবল মনের লয় বা নিগ্রহ না হওয়া হেতু, মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সুতরাং প্রকৃত মোক্ষপ্রাপ্তি তখনও দূরে থাকে।

শাস্ত্রকর্ত্তারা মনোলয় বা চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ জন্য নাদ-অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাম্ভবী মুদ্রার দ্বারা কতিপয় ইন্দ্রিয় নিরোধ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণবিবরদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতির বিবরগুলি রুদ্ধ করিলে কর্ণে ঝিল্লী রবের ন্যায় অস্ফুট নাদ শ্রুত হওয়া যায়। উহা ঝিল্লী বা তদ্রূপ কোন কীটের নাদ নহে। প্রকৃত পক্ষে দেবদুন্দুভি-নাদ। উল্লি-খিত নাদের সহিত মনের লয় করিতে আরম্ভ করিলে উত্তরোত্তর ঝিল্লীর ন্যায় ক্ষুদ্র নাদ বিদূরিত হইয়া তান ও লয়বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীর ন্যায় এবং নানা প্রকার গম্ভীর নিনাদ সকলও শ্রুত হইতে আরম্ভ হয়। উহা দ্বারা অন্তঃকরণে বিশেষ পুলক জন্মে। নাদের সহিত মনের লয় করিতে আরম্ভ করিলে প্রোক্ত পুলক হেতু উহা অন্যত্র যাইতে চাহে না; ক্রমে উহার সহিত লয় হওয়ায় আপনার জন্মস্থান প্রকৃতিতে লয় পাইতে আরম্ভ

করে এবং কালে লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের সর্ব্বপ্রধান (General) (সেনাপতি) ব্রহ্মেন্দ্রিয় মন এইরূপে নিগৃহীত হইলে, উহার অধীন চক্ষু প্রভৃতি (Colonel) অধীন সেনাপতিগণও সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন তত্ত্বের পর তত্ত্ব লোপ পাইতে থাকে। চক্ষু আছে অথচ রূপগ্রহণ করে না। কর্ণ আছে কিছু শ্রবণ করে না। ইত্যাদি-রূপে লোপ পায়; অথচ মৃতের ন্যায় দেহে পূতিগন্ধ উপস্থিত হয় না। এইরূপে সমস্ত তত্ত্ব বিলুপ্ত হইলে উহাকেই হিন্দুশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধ কহে। এই সময়ে প্রকৃত নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়। কৈবল্যলাভ নিকটবর্ত্তী হয়। জীব ক্রমে সমস্ত প্রকার প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রকৃত আত্মজ্ঞানলাভের সুসময় উপস্থিত হয়। নিরবলম্ব সমাধির ফলে, যখন সেই যোগীর অন্তঃকরণে "সোহং" এই অদ্বৈত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন সেই জীব পরম ব্রহ্মে লয় অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল, বলা যাইতে পারে। "সোহং" অর্থাৎ পরমাত্মা আর কেহ নাই, আমিই সেই পরমাত্মা। জীব পরমব্রহ্মে লীন হওয়ার পূর্ব্বে উল্লিখিত অদ্বৈত জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। পরম ব্রহ্মে সম্পূর্ণ লীন হইলেই উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। উল্লিখিত সময়ে পরমাত্মা এবং জীবাত্মারূপ পতি ও পত্নীর প্রকৃত যুগল-মিলন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সর্ব্ববিধ তাপ চিরনিবৃত্ত হয় জন্য ইহাকে নির্ব্বাণ মুক্তি বা যোগের চরম সমাধি বলিয়া থাকে। মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য না করিয়া মহানির্ব্বাণলাভ অপেক্ষা দুর্লভ মনুষ্যজন্মে উচ্চ আশা আর হইতে পারে না। যে সাধক শুভাদৃষ্টবলে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র শিবকে পরমশিবে পরিণত করিয়াছেন এবং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ বা চরমসমাধিস্থ হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ধন্য। তিনি আত্মতত্ত্ব বিদ্যা এবং আত্মজ্ঞানের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। অন্যের পক্ষে উহা কেবল কল্পনাবিজড়িত দাম্ভিকপ্রলাপ মাত্র।

অত্র স্থলে অপর একটী কথা বক্তব্য এই যে, মহাপুরুষ চণ্ডীদাস, জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে বাসুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজক ছিলেন। তিনি শাক্তসন্তান। উক্ত গ্রামে অন্যান্য বহুসংখ্যক শাক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ঘটনার চক্রে মন্দিরের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রামাণী ধোপানী-নাম্নী একটী বালিকার সহিত চণ্ডীদাসের সংযোগ হয়। অল্পকালমধ্যেই উহা সাধারণের গোচর হইল। প্রথমে শাসন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় গ্রামবাসীর চেষ্টায় তিনি পূজকের কার্য্য হইতে দূরীভূত হইলেন। বিগ্রহপূজার বন্ধন দূর হইলে চণ্ডীদাস সেই ধোপানীর চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু ধোপানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, তাঁহার অন্তরে প্রীতিপ্রদ না হওয়ায় নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শাক্তসন্তানের নিকট নিষ্কাম ধর্ম্মের শুষ্ককাষ্ঠ-চর্ব্বণ প্রীতিজনক না হওয়ায় রসকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রযুক্ত, বোধকরি চণ্ডীদাসই সর্ব্ব প্রথমে নিজ অদ্ভুত প্রতিভাবলে শুষ্ক নিষ্কাম ধর্ম্মের মধ্যে রসের উপাসনা প্রচলিত করেন। * 'রসিক বৈষ্ণবের ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে সকাম ধর্ম্ম।' উহাকে নিরপেক্ষ ভাবে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। উপরে মহাজনপ্রদত্ত একটী নিষ্কামের আবরণ আছে মাত্র। রসিক বৈষ্ণবের ধর্ম্মকে সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের খিচুড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সকাম ধর্ম্মকে নিষ্কামের আবরণে আচ্ছাদন করিয়া চণ্ডীদাস নিজ অদ্ভুত প্রতিভার বল দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে রসের উপাসনা বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। কিন্তু চণ্ডীদাস ও পরবর্ত্তী মহাজনদিগের চেষ্টায় বৈষ্ণব-উপাসকদলের মধ্যে উহা বিশেষরূপেই প্রচলিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-উপাসকগণ যাঁহারা

* অনেকে বলেন, জয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম্মে রসের সাধনার প্রথমপ্রবর্ত্তক। তাঁহার সময়ে উহা বীজরূপে রোপিত, কিন্তু চণ্ডীদাসের সময়ে উহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখা ও পল্লব বিস্তার করে।

পূর্ব্বে শুষ্ককাষ্ঠ-চর্ব্বণে কালাতিপাত করিতেন, তাঁহারা রসের ধর্ম্ম বা প্রকারান্তরে রসগোল্লার আস্বাদ পাইয়া দলে দলে রসের সাধনে ভক্ত হইতেছেন। সহজ-ভজন শাক্তের প্রণালী, উহাতে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা আছে। সুতরাং তিন জন্মে অর্থাৎ অল্পকালে আর বৈষ্ণবধর্ম্মে সাত জন্মে অর্থাৎ দীর্ঘকালে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। সহজ-ভজন পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কতিপয় মহাজন ও মহাপুরুষের প্রতিভাবলে আংশিক রূপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভাই পাঠক! আমি একজন বন্ধনদশাবিশিষ্ট প্রকৃত সংসারকীট। সাধকত্ব বা সিদ্ধির অবস্থা আমাতে কিছুই নাই। বিদ্যাও অতি সামান্য। আত্মতত্ত্ব হিন্দুজাতির পরম রমণীয় মহাগৌরবের বিদ্যা। আত্মতত্ত্বের সমালোচনা মাদৃশ ক্ষুদ্রের পক্ষে এককালেই অসম্ভব। ঘটনার চক্রে এবং বিধাতার ইচ্ছায় সংসারে বদ্ধ হইয়াও নির্ল্লিপ্তের ন্যায় আত্মতত্ত্ব সমা-লোচন জন্য একাগ্র হইয়াছিলাম। উহার ফলেই যথাসাধ্য সমালোচনা প্রকাশ করিলাম। আমার এই গ্রন্থ প্রাচীন আত্মতত্ত্ব নহে, উহার একটা সমালোচনা মাত্র। কল্পনাবিজড়িত করিয়া প্রলাপ-উক্তি ইচ্ছার বাহিরে ছিল। যাহা সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। সংস্কৃতে আমার জ্ঞান অতি সামান্য; সুতরাং আত্মতত্ত্ব সমা-লোচনায় পদে পদেই ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা। কেহ কৃপা করিয়া ভ্রম দেখাইয়া দিলে, পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংস্কার করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। যে সমস্ত মহাজন ও মহাপুরুষগণ আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম জয়যুক্ত হউক। হিন্দুশাস্ত্রকার-দিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

সুইপিং ত খতম হুয়া। চারো তরফ ঘুম ঘুম কর, যো কুছ ময়লা

নজর আয়া, সব একদম সাফ ও সুথরা কর ডারা। মগর মেহনত কী মজদুরী নহি চাহতে, মুফ্‌তমে ভারতকী খিদমৎ কিয়া। তা হম জরাসা শরাবকে লিয়ে কেতনা চিল্লায়া কোই শুনা নহি। কোই শুনতা নহি, ন কোই দেখ্‌তা হৈ; আহা ক্যা হুয়া রে। ভারত ঐসি বেইমানী অচ্ছি নহি। মেহতর বহুত হয়রান হুয়া; অব জরা আরাম করনা চাহ্‌তা হৈ, কোই হম্‌কো থোড়াসা দারু দেবে। আনন্দসে মস্ত হোনেকে লিয়ে আনন্দময়ী মাকো ভোগ লগাবেগে, মেহেরবান্‌ ভারত বি. এন. রায়কো থোড়া দারু দেবে। মেথরকো থোড়া দারু দেবে, দারু দেবে, দারু দেবে।

অব ভাইলোগ জরা বিচার কর দেখে কি নীচে কা দস্তখৎ ঠিক হৈ কি নহি।

B. N. Ray

The great sweeper of India. During His Majesty, The Emperor Edward Seventh's Reign.

অগর ঠিক নহি ত বি. এন. রায় কিস্‌ টাইটেল পানেকা লায়েক হৈ?

হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র পাঠকগণ! বি. এন. রায় আপনাদের বিবেচনায় কি উপাধি পাইবার যোগ্য?

ভারতসন্তানগণ! ভারতের মঙ্গল অন্তরের কামনা বটে, কিন্তু আশার সাফল্য ত কিছুই দেখি না। ভারতের মঙ্গলচিন্তায় জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্যে শান্তি ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু হায় রে! শান্তির অস্তিত্ব আর কোথায়? কর্ম্মকাণ্ডে আহার সর্ব্বাগ্রে। আহারাভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল ও আনন্দ বিনষ্ট হয়। ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের আহারের মূল এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ যেরূপে বিনষ্ট হইতেছে, উহার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছি। পুনরাবৃত্তি বিরক্তির কারণ। অথচ এ দিকে অন্নমূলসংশোধন ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা

হইতে পারে না। সুতরাং পুনরাবৃত্তি না করিয়াই বা উপায় কি? হিন্দু, মুসলমান এবং দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জ যদি কোন দিন "A joint stock without shareholder's Council, the ruin is inevitable. (অংশীদারসভা-বিহীন জএণ্ট ষ্টকের পতন অবশ্যম্ভাবী) এই সূক্ষ্মতম "The point" আন্দোলন ও আলোচনায় মত্ত হইয়া আমাদের সম্রাট্ এবং দেবভাবাপন্ন প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের অন্নমূলসংশোধনের সূত্রপাত হইতে পারে। ভারত যে কোন হুজুকে মত্ত হউক না কেন, আমার বিশ্বাস যে, উপরোক্ত "The point" (দি পয়েণ্ট) আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই। যাহারা শ্রমজীবী বা যে ব্যক্তি শ্রমজীবীর শ্রেণী হইতে প্রথমেই কেবল Capitalist (ক্যাপিট্যালিষ্ট) পদে উন্নীত হইয়াছেন অথবা পোষ্যপুত্রগণ উপরোক্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য্য উৎকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও ক্যাপিট্যালিষ্ট (ধনী) সন্তানগণ যে কি জন্য বুঝিলেন না, অন্তরে বিশেষ আক্ষেপ রহিয়া গেল। যাঁহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশকে ধনশালী করিবার জন্য লালায়িত, দেশের ধনবান্‌গণ কি জন্য রসাতলে যাইতেছে, তাঁহারা কিন্তু কেহ প্রণিধান করিলেন না। ধনবান্ পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করিলেই উহার অধঃপতনের কারণ পরিস্ফুটরূপে দেখা যাইতে পারে। হায় রে! অন্নাভাবে ভারত সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল! যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি সূক্ষ্মতম বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু যাঁহারা সবিশেষ বুঝিয়াও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে বালুকাপূর্ণ গণিকা কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া পৈত্রিক তড়াগে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পাপদেহের অবসান করাই উচিত।

বৃটীশদ্বীপসমূহ কেবল দানবে পরিপূর্ণ নহে। দেবপ্রকৃতি মহাত্মা পুরুষও যথেষ্ট আছেন। দানবের অধিকার অক্ষুণ্ণ হইলে মহাশক্তি

প্রবুদ্ধা হইয়া দনুজদলনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সমস্ত সংহার করেন ও করিতেন। দেবতার অস্তিত্ব আছে জন্য অদ্যাপি বৃটীশদ্বীপবাসী "বৃটিশসিংহের রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না" এই অভিমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছেন। হতভাগ্য ভারত যদি বৃটীশ-দ্বীপস্থ দেবতাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে, মঙ্গলের স্রোত বহিতে পারে, নতুবা সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। নিন্দুকে নিন্দনীয় বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিলে জগতে কলঙ্কের ভয়ে দেব-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের বিপথে ভ্রমণ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত হয় না। প্রাণ কাঁদিয়াছিল, পরিশ্রমও যথেষ্ট করিয়াছি, কিন্তু দেবতাদিগের কর্ণ-গোচর অথবা ভারতের চৈতন্য পর্য্যন্তও সম্পাদন করিতে সক্ষম হইলাম না। অন্তরে বিশেষ আক্ষেপ রহিয়া গেল। কোন স্বার্থত্যাগের কথা বলিতেছি না, ইংরেজ বিজেতা এবং আমরা বিজিত। আমাদিগের কোন ভাষায়, ভ্রমেও তাঁহাদিগের অভিমান দলিত হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কোন প্রকারের Brutal (ব্রুট্যাল) বা Brutality (ব্রুট্যালিটী অর্থাৎ পাশব) আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত। একা সাধ্য নাই, আইস ভাই, সকলে একত্র মিলিত হইয়া আমাদের মর্ম্মব্যথা সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুর এবং বৃটিশদ্বীপের দেবতাদিগকে জানাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র সংখ্যা সংখ্যারূপে প্রকাশকালে দেশী সংবাদ বা সাময়িক পত্রে সংখ্যাগুলির দুই চারিটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম পাঁচ সংখ্যা একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ হইলে, সমালোচকগণ স্তম্ভিত-ভাবাবলম্বন করিলেন কেন বুঝিতে অক্ষম। কেবল পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-মহারথী শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু হায় তিনিও মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে একটী কথাও না বলিয়া চতুর-তার সহিত কেবল অবান্তর কথায় পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। সানুকূলে

বা প্রতিকূলে হউক, তজ্জন্য কোন অনুরোধ নাই, বরং সমালোচকগণ ভ্রম দেখাইয়া দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে দূষিত অংশ সংস্কারের সুবিধা হয়, সুতরাং উহা দেখিতে পাওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রে যাহা কিছু প্রকাশ করা ইচ্ছা ছিল, যতদূর স্মরণ হইয়াছে, সংক্ষেপে বলা কিছুই বাকি রাখি নাই। দেশত্যাগে ও বনবাসে দীর্ঘকাল অবস্থিতির দরুণ দেহ ও মন বিশেষ অবসন্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিন্তায় সাধ্য নাই, কর্ম্মেও সামর্থ্য নাই। সর্ব্বদা কেবল বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেই ইচ্ছা করে। আমি অতঃপর পাঠক ও অনুগ্রাহকের সাহায্যে হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের একবার সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক দূষণীয় অংশগুলি দেখাইয়া দিয়া কেহ পুস্তকসংস্কারের সহায় হইবেন কি ?

এই পাগলার সমর্থন জন্য ভারতে লোক মিলিল না। কোন ভ্রাতা আমার বাহুরূপে দণ্ডায়মান হইলে, লাভবান্ ব্যতীত কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। আমাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ বোধ করে, এরূপ লোক কি ভারতে নাই ? হায় রে ! যদি কোন যোগ্য ভ্রাতাকে আমার ডমরুদাররূপে পাইতাম, তাহা হইলে এত দিন "A joint stock without shareholder's council, the ruin is inevitable" এই মহাবাক্যটী হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং সলিমান ও হালা পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ব্রহ্ম ও চট্টগ্রামের পাহাড় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রতিধ্বনিত হইত। অপিচ এতদিন প্রতীচ্য দেশেও,, আন্দোলনের উদ্যোগ শেষ হইত। ভাই ভারত ! কদাচ ভুল করিও না। ভ্রম বুঝিলে নিস্তার নাই। আমার একটী বিশ্বাসের কথা বলিতেছি যে, হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র ইংরেজিতে অনুদিত হইলে বৃটিশদ্বীপের দেবগণ, সংস্কৃতে অনুদিত হইলে পৃথিবীর যেখানে যে কোন, সংস্কৃতজ্ঞ নরাকৃতি দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই জাগ্রত হইয়া ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন। তাঁহাদিগের নিন্দার বেগ অসহ্য বোধে

সভ্যতাভিমানী বৃটিশসিংহ administration (এডমিনিষ্ট্রেসন) এর আমূল সংস্কার করিতে বাধ্য হইবেন। পরন্তু জগদ্‌গুরু হিন্দুজাতির আত্মজ্ঞানের মর্ম্ম সর্ব্বত্র ঘোষিত এবং আন্দোলিত হইয়া পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় দৃশ্য উপস্থিত করিতে পারে। ইংরেজজাতি হিন্দুস্থানকে ম্লেচ্ছস্থানে পরিণত করিবার জন্য যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু হায়! মুষ্টিমেয় হিন্দুসন্তান একাগ্র হইয়া ধীর ও স্থিরভাবে চেষ্টা করিলে, একমাত্র নিপ্‌ মহাস্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই ম্লেচ্ছস্থান বৃটিশদ্বীপসমূহ হিন্দুস্থানে পরিণত হইতে পারে। ইংরেজজাতির গুণগ্রাহিতায় কোন ত্রুটী নাই। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র হিন্দীতে অনূদিত হইলে সমগ্র ভারত একাগ্র বা একতান হইয়া শুভাদৃষ্টের অন্বেষণে বদ্ধ-পরিকর এবং সাধনের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে পারে। যিনি যাহাই বিবেচনা করুন "গিয়াছে সকল ভয়, নাহি কিছু ভাবনা। দিন, মাস, পক্ষ, বার নাহি করি গণনা।" আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমার সমর্থনের জন্য লোক মিলিবে এবং আমার চিতাভস্মের উপর গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদিরা উপহার দিয়া লোকে আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিবে। কিন্তু জীবিত বি. এন. রায়ের ভাগ্যে কিছুই হইল না। কবি নানা উদ্যান হইতে কুসুম চয়নপূর্ব্বক হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের প্রত্যেক সূত্রে মালা স্তবক অলঙ্কার ইত্যাদি গাঁথিয়া ভারতীর নানা অঙ্গ সাজাইবে। অদৃষ্টে নাই, তাই বুঝি সূত্রপাত দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। বিধাতার লীলা বুঝে কাহার সাধ্য? বিধাতঃ! ভারত দুঃখসাগরে ডুবিয়াছে, এখনও কি তোমার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয় নাই? হায় রে! সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম, কূলে বুঝি বা প্রাণ গেল!

"চঞ্চল অতি, অতি ধাওল মতি, নাথ তরে ভব ভুবনে।
শশী ভাস্কর, তারানিকর, পুছত সলিল পবনে॥
(ও কেউ দেখেছ নাকি) (আমার হৃদয়নাথে)

হে সুরধুনি, সাগরগামিনী, গতি তব বহুদূরে। (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝুরে ॥
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু, দিটি তব বহুদূরে।
(গগন মাঝে যে থাকে) (বল্‌লে বলতেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাম মম কোন পুরে ॥"

ভগবন্! স্বর্গে, ভেস্তে, কৈলাসে, গোলোকে, বৈকুণ্ঠে বা প্যারা-ডাইজে যে স্থানেই থাক, একবার অবতীর্ণ হইয়া ভারত রক্ষা কর।

জয় জয় কালি, তারা ব্রহ্মময়ি, ধরি মা গো তোর, দুখানি পায়।
বুভুক্ষু ভারতে, অন্ন দে অন্নদে, প্রণাম করিল, ভবানী রায় ॥

"কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎ কৃতং ময়া।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হর দেবি হরপ্রিয়ে ॥

ব্যূহভেদ সাঙ্গ হইল। *জয় কালী মায়ীকি জয়, জয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের জয়, জয় মাতৃরূপিণী সম্রাজ্ঞী আলেক্‌জেন্দ্রার জয়, জয় রাজপ্রতিনিধি আরল মিণ্টো বাহাদুরের জয়, কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়। পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি।

Good bye all, Good bye all, Good bye all.

আমি বিদায় হইলাম।

"শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতিভারং ॥"

---

* অত্র সংখ্যার পাণ্ডুলিপি প্রথমে নবদ্বীপে লিখার সূত্রপাৎ হয়, পরে চিথলিয়া ও চণ্ডীপুর গ্রাম, পাবনা টাউন এবং কলিকাতা মহানগরীতে অবশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হইয়া যন্ত্রস্থ হইয়াছে। বিগত শ্রাবণের শেষভাগে লিখা সমাধা হয়। মূল বিষয়টী লর্ড কার্জ্জনকে উপলক্ষ করিয়া আরম্ভ করা হয় এবং শেষ কর্ত্তব্য সমাধার জন্য বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয়কে আহ্বান করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছিলাম। ভাদ্র মাসের প্রথমেই হিন্দী বঙ্গবাসী পাঠে অবগত হইলাম যে, ভায়া যোগেন্দ্র

আর ইহ সংসারে নাই। তাড়িৎগতিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হিন্দাতেই বলিলাম, ওহোত্তও সত্যানাশ হুয়া, সব বরবাদ কিয়া, সব একদম বিগাড দিয়া। পর সপ্তাহেই অবগত হইলাম যে, লর্ড কার্জ্জনও পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং যে মূর্ত্তিটা গঠন করিয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। ৺ শারদীয়া পূজার পরে পাণ্ডুলিপির আংশিক পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক বর্ত্তমানরূপে যন্ত্রস্থ করিয়াছি। প্রায় এক বৎসর হইল ভারত স্বদেশের আন্দোলনে মত্ত হইয়াছে। আমার আন্দোলনেও স্বদেশ সম্বন্ধেই বটে, কিন্তু ২৩।২৪ বৎসরের পুরাতন। ঘটনার চক্রে আমার আন্দোলন ভারতের মহা আন্দোলনের সময়েই সমাপ্ত হইল। ইহা দ্বারা ভারতের সামান্য উপকার হইলেও সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশিষ্ট।

(ক) আমার পিতামহ এবং নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় শেলবর্ষ পরগণার মুসলমান জমিদার মৃত আসাদ জমান চৌধুরী সাহেবের সাহায্য পাইয়া দস্যুপ্রধান পণ্ডিতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। (৫ম সংখ্যা)

(খ) নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত রাজা দর্পনারায়ণরায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের বিবাদে সম্রাট জাহান্দার সার সময়ে সৈয়দ উজীরের আধিপত্যকালে সম্ভবতঃ নাটোররাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সময়ে বার ভুঁইয়ার অন্যতম সাঁতৈলরাজ ন্যূনাধিক ৬।৭ সহস্র সৈন্য প্রতিপালন করিতেন। যুদ্ধকালে দ্বিগুণ পরিমাণে সৈন্য উপস্থিত করিতে পারিতেন। তিনি বিনা যুদ্ধে পৈত্রিক সম্পত্তি বিসর্জ্জন করেন নাই। সাঁতৈলরাজ সবংশে নিপাতিত হইলে আর কোন জমিদার রাজা রামজীবনের সহিত বিবাদে সাহসী হন নাই। (৫ম সংখ্যা)

---o---